LORETO HOUSE
“হতে চাই”
রোদ্দুর

অধ্যক্ষার বার্তা

শ্রীমতী পি.বাগচি

রোদ্দুর’ পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে আমি আমার সকল সহকর্মী ও ছাত্রীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন। আমার ছাত্রীদের সৃজনশীল সত্তাকে মাতৃভাষায় ফুটিয়ে তোলার এক অনন্য মঞ্চ হলো এই পত্রিকা। প্রকৃতপক্ষে, সৃজনশীল চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সমৃদ্ধ ভাষার নিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের বিশ্বদরবারে মেলে ধরতে পারি এবং সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

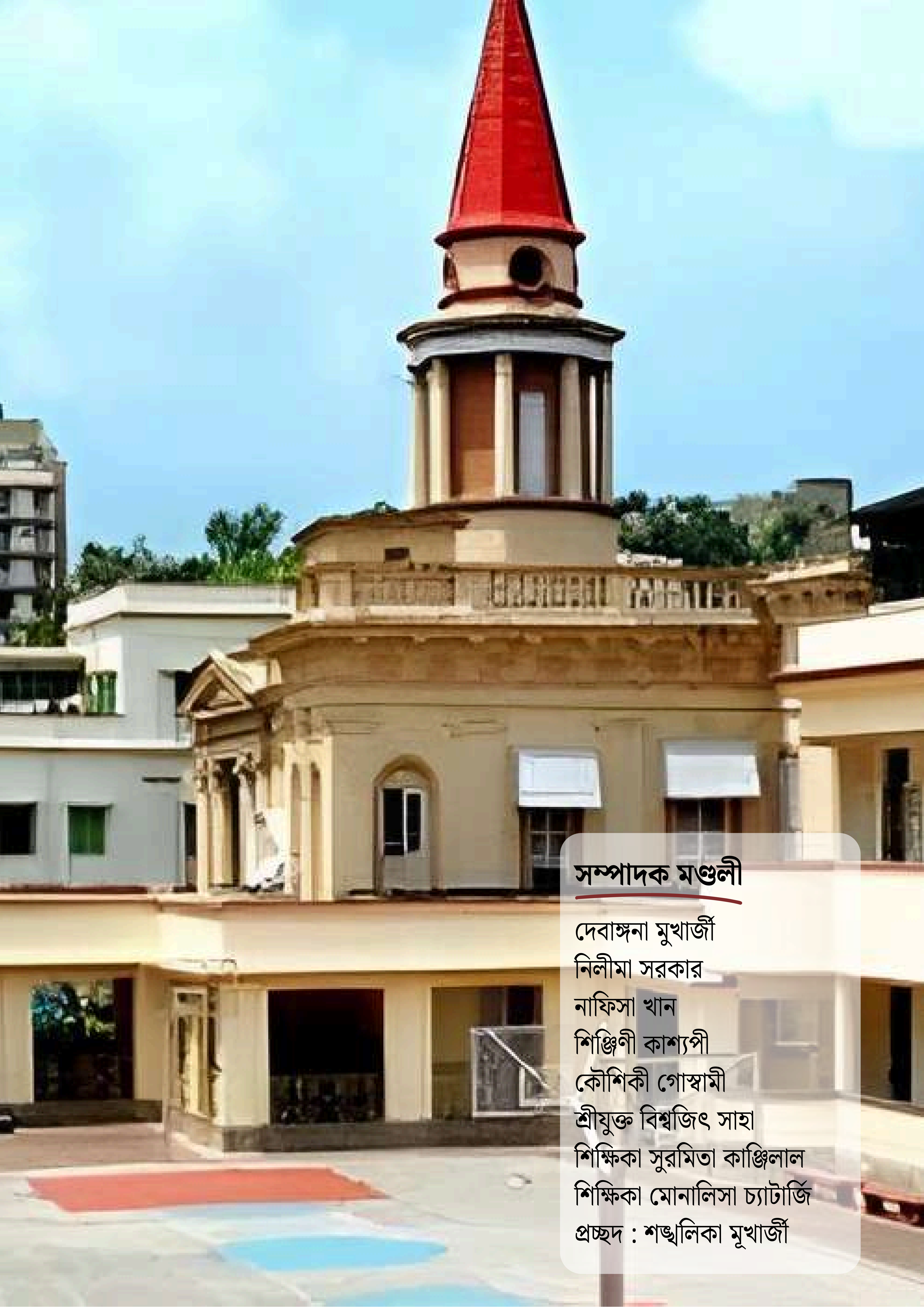

সম্পাদক মণ্ডলী

দেবাঙ্গনা মুখার্জী
নিলীমা সরকার
নাফিসা খান
শিঞ্জিণী কাশ্যপী
কৌশিকী গোস্বামী
শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ সাহা
শিক্ষিকা সুরমিতা কাঞ্জিলাল
শিক্ষিকা মোনালিসা চ্যাটার্জি
প্রচ্ছদ : শঙ্খলিকা মূখার্জী

রোদ্দুর

স্মৃতির কোলাজ থেকে আগামীর স্বপ্ন

পুরনো দিনের সেই হারানো সুর আর অমলিন স্মৃতিগুলোকে পাথেয় করে আমরা আবারো ফিরছি ২০২৭ সালে| আপনার প্রিয় পত্রিকাটি নতুন আঙ্গিকে, নতুন সজ্জায় কিন্তু সেই একই ঐতিহ্যের ধারা বহন করে পুনপ্রকাশিত হতে চলেছে।
গত বছর যখন 'রোদ্দুর' তার নতুন পথচলা শুরু করেছিল, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবল একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা। কিন্তু সেই যাত্রায় আমরা যা পেয়েছি, তা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেছে। আমরা দেখেছি, কীভাবে একটি সাদা পাতা শিশুদের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে। গত বছরের সেই দিনলিপিগুলো আজ আমাদের প্রেরণা, যা আমাদের বাধ্য করেছে এই শিক্ষাবর্ষেও (২০২৫-২৬) নতুন উদ্যমে ফিরে আসতে।
আমাদের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের মনের গহীনে বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জাগিয়ে তোলা। তাদের কল্পনাশক্তিকে ডানা মেলার সুযোগ করে দেওয়া এবং চারপাশের চেনা প্রকৃতি ও পৃথিবীকে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রীরা যে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দেখে, সেই মাধুর্যকে খুঁজে বের করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।
'*রোদ্দুর*' (২০২৫-২৭)কেবল একটি ই-পত্রিকা নয়; এটি আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ। তাদের হাতে লেখা কবিতা, গল্প, মননশীল প্রবন্ধ এবং তুলির টানে ফুটে ওঠা বৈচিত্র্যময় চিত্রকল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রতিভার ক্যানভাস। এটি ছাত্রীদের প্রচেষ্টায়, ছাত্রীদের জন্যই নির্মিত একটি মঞ্চ।
এই যাত্রায় আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষিকা *মিসেস পি. বাগচীর* কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই পুনরুত্থান সম্ভব হতো না।বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের বাংলা বিভাগের প্রধানা *মিস এম. চ্যাটার্জির* প্রতি, যাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগ ও নির্দেশনায় *রোদ্দুর* আজ আবার আলোর মুখ দেখল।

-দেবাঙ্গনা মুখার্জী

তুমিও হেঁটে দেখো

কলকাতা

সানন্দী দাশ

ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ মহানগর, যার নগর নকশা ইতিহাস, সমাজ ও আধুনিকতার এক সুগভীর সংলাপের ফল। এই শহরের নকশাগত পরিচয় কেবল স্থাপত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা নাগরিক স্মৃতি, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের বহুমাত্রিক প্রতিফলন।
ঔপনিবেশিক শাসনামলে কলকাতার নগর পরিকল্পনায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে। প্রশস্ত সড়ক, সুনির্দিষ্ট জোনভিত্তিক বিন্যাস, স্তম্ভ ও গম্বুজনির্ভর ভবনশৈলী প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। তবে এই ইউরোপীয় নকশা নিছক অনুকরণ ছিল না; স্থানীয় জলবায়ু ও পরিবেশগত বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উঁচু ছাদ, দীর্ঘ বারান্দা এবং প্রাকৃতিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সংযোজিত হয়, যা স্থাপত্যকে কার্যকর ও টেকসই করে তোলে।
উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়িগুলি শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর অন্তরঙ্গ দলিল। আঙিনা-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা, অলঙ্কৃত দরজা-জানালা, লোহার গ্রিল ও সূক্ষ্ম কাঠের কাজ—সব মিলিয়ে এই আবাসনগুলি বাঙালি পারিবারিক জীবনের নান্দনিকতা ও কার্যকারিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে স্থাপত্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পরিসর হিসেবে কাজ করে, যেখানে উৎসব, আচার ও দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিকভাবে আবর্তিত হয়। এই পরিসরেই বিকশিত হয়েছে কলকাতার সাহিত্যচর্চা ও বৌদ্ধিক আন্দোলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক চেতনা কলকাতার নকশায় এক গভীর মানবিক মাত্রা সংযোজন করেছে। একইভাবে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী ও সাম্যবাদী চেতনা শহরের প্রাণবন্ত রাস্তাঘাট ও জনজীবনের গতিশীলতায় প্রতিফলিত হয়েছে। আবার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে নস্টালজিক ও অন্তর্মুখী কলকাতার ছবি উঠে আসে, তা শহরের নকশায় এক ভাবুক ও স্মৃতিমগ্ আবহ সৃষ্টি করে। ধর্মীয় স্থাপত্য কলকাতার নকশায় বহুত্ববাদী চরিত্র সংযোজন করেছে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও মঠ—প্রতিটি নিজস্ব নকশাভাষায় শহরের সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের বার্তা বহন করে। এই বৈচিত্র্য নগর পরিসরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক দৃশ্যমান প্রতীক।

আধুনিক কালে সল্টলেক ও নিউ টাউনের মতো পরিকল্পিত অঞ্চলে কলকাতার নকশা নতুন দিশা পেয়েছে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, সবুজ পরিসর, জনপরিসরের সম্প্রসারণ এবং নদীকেন্দ্রিক পরিকল্পনা শহরের কার্যকারিতা ও বাসযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ, পুরনো পাড়া পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিক নকশায় ঐতিহ্যবাহী উপাদানের সংযোজন "হেরিটেজ-সেনসিটিভ ডেভেলপমেন্ট"-এর ধারণাকে সুদৃঢ় করছে।

পরিশেষে বলা যায়, কলকাতার নকশা একটি চলমান নগর বিবর্তন—যেখানে অতীত ও বর্তমান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে শহরের স্বাতন্ত্র্য, স্থায়িত্ব ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সংরক্ষণ ও বিকশিত করে।

আমি চিঠি হই
নেমেসিস নামে
শিঞ্জিনী কাশ্যপী

ক

“তোমার মনের ভেতর যাই
মুখের ভিড়ে মুখোশ পাই”

সবে চোখটা লেগেছে। তীব্র, একঘেয়ে রিংটোনটা সজাগ হয়ে উঠল ঋত্বিক। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার, দূরে কোথাও দু-চারটে কুকুর ডেকে উঠে মাঝে মাঝে - রাস্তার নিভু নিভু আলোয় ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছয়।বড় বিরক্ত লাগে ঋত্বিকের। এই তো সে নাইট ডিউটি সেরে ফিরেছে—সারাদিন, সারারাত অজস্র খাটাখাটনি, ঘাম, ধুলো, ঝগড়া, দৌড়ঝাঁপ... আর ঠিক যখন ক্লান্তিতে চোখটা দু'মিনিটের জন্য বুঝে এসছে তখনই ফোনটা বেজে ওঠে মাথাটা প্রচণ্ড গরম হয়ে | তবে সে খানিকটা নিজের জেদেই পুলিশের চাকরিটায় ঢুকেছে—খানিকটা নিজের মা-বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে। তার মা-বাবা ভেবেছিল, ছেলে যদি পুলিশ হয় তবে নিঃসন্দেহে ঘুষ খেয়ে বখে যাবে।কিন্তু প্রত্যেকটা কেসে ঋত্বিক যখন কারও সাহায্য ছাড়া, ঘুষ না খেয়ে, সৎপথে থেকে সমাধান করে, তখন তার মনে হয়—সে যেন বারবার প্রমাণ করে, সবাই একরকম নয়।এই একটাই কারণে এখন এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঋত্বিককে ফোনটা তুলতে বাধ্য করে।

ফোনের ওপার থেকে ভেসে এল সাব-ইন্সপেক্টর সহেলি দেবনাথের গলা—“স্যার, আপনি জলদি আসুন, এস. এন. ব্যানার্জী রোড এ একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে ।”

১

“ঘাসের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে শিকারী যেন”

অন্ধকার এক ঘরে বসে একা একটা ছেলে | অবাক হয়ে সে শুধু ভাবে পয়সার কি অসীম ক্ষমতা যে ক্ষমতাবানদের মাথাও নিমেষে নিচু করে দিয়ে। বিবেক মান-সম্মান সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে হয়ে ওঠে তারা কিছু নোটের কেনা গোলাম।তবে এতে তার অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই খানিকটা বেশি।

আম্বেদকর ভদ্রলোক এমন পাপ কাজও করতে পারে—তা বোধহয় ভেবে দেখেননি। নইলে ফাঁসির জায়গায় হয়তো লিখেই যেতেন—এদের মতো লোকদের গরম তেলে ফ্রাইড চিকেনের মতো ভাজতে হবে!

এই ভাবনাতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ছেলেটি। তার হাসির আওয়াজ গমগম করে ওঠে সারা ঘরময়—কিন্তু অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তার চোখ দিয়ে নেমে আসা দু’ফোঁটা জল |

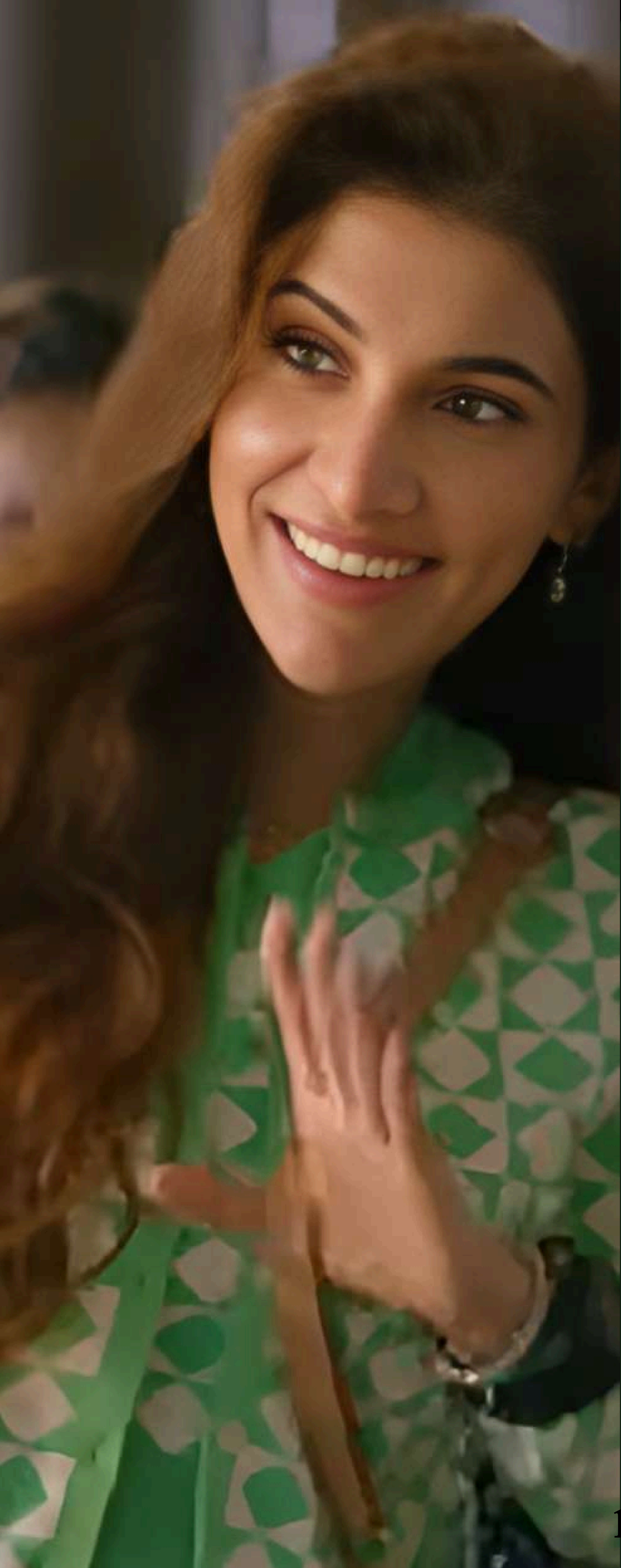

অ

"প্রিয় যদি হয়,
অচেনা ভয় কেটে যাবে"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে স্নেহা। সহপাঠী রূপম, অঙ্কিত, পীযুষের সাথে কলেজের ক্লাস ব্যাংক মেরে পল্টুদার দোকানে বসে চা, বিস্কুট এবং আড্ডায় মশগুল ছিল চার মূর্তি।মা যে কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, তা না মেনেই ক্লাস ব্যাংক মারছিল স্নেহা। প্রথম প্রথম মা একটু বকত—"তোর এত ছেলেদের সাথে মেশা কেন রে? দেখিস না নিউজে কী হচ্ছে আজকাল?"স্নেহা হেসে বলত, "মা, তোমার মেয়ে ছেলেদের সাথে না মিশে যদি মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তুমি বুঝি বেশি খুশি হবে?"মুখ বেঁকিয়ে মা 'হুঁ' বলে চলে যেত।স্নেহারা LGBTQ ব্যাপারে জানলেও, তাদের মা-বাবার কাছে ব্যাপারটা মোটেই পছন্দের ছিল না। তবে মা বোধহয় বুঝেছিল, এই তিন ছেলের সাথে তার মেয়ে সুরক্ষিতই আছে। তাই এ নিয়ে আর কিছু বলেনি। ওদের প্রতি মায়ের একটা ট্রাস্ট জন্মে গিয়েছিল।

তবে একটু চাপ খেত স্নেহা — রূপম টা আসলে ... ওর প্রতি ইএ মানে ওই ব্যাপার যেন ক্রমেই বাড়ছিল |

খ

"তোমার ঘরের ভেতর যাই
চামড়া পোড়ার গন্ধ পাই"

এস. এন. ব্যানার্জী রোড এ পৌঁছে ঋত্বিক ঘটনার বীভৎসতা টা টের পায়। একটি ৩০ বছরের ছেলে। এবডোমেন এর নিচের গোটা জায়গা টা নিপুন ভাবে দেহের বাকি অংশ টুকু থেকে বাদ পড়েছে। সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য ক্ষত, যেন প্রতিটা আঘাতের পেছনে ছিল ঘৃণা, রাগ, আর এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর আনন্দ। চোখের নিচে জমাট বাঁধা কালো ছোপটা দেখে মনে হয়, শেষ মুহূর্তে সে কিছু দেখেছিল—ভয়ংকর কিছু। থুতনির অংশটা বিকৃত, আর শুকিয়ে যাওয়া কালো রক্ত এমনভাবে লেগে আছে, যেন সময় নিজেই থেমে গিয়েছিল ওই মুহূর্তে। অনেক কেস হ্যান্ডেল করছে ঋত্বিক। কিন্তু এই কেস এর নৃশংসতা ,তার মতো অভিজ্ঞ মানুষ এর ও গা গুলিয়ে দিয়েছে।

ফরেনসিক টীম ইতি মধ্যে চলে এসেছে। বডিটা পোস্টমর্টাম এ পাঠাতে পাঠাতে বেজে গেলো ৬ টা।ঋত্বিক আর সোহেলী উল্টো দিকের এক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলো । অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ঋত্বিক। সোহেলী জিগেস করলো ," কি বুঝছেন স্যার ?" চায়ের গ্লাস টা নামিয়ে রেখে , ওয়ালেট থেকে টাকা বার করতে করতে ঋত্বিক উত্তর দিয়ে ,"কাজ টা বড্ডো বেশি ঘৃণা থেকে করা। মুখের ওপর চারটে দাগগুলো লক্ষ করেছো?"

আ

"তোমার জ্বরের খবর পাই
এই অসুখের ওষুধ চাই"

জুরিসপ্রুডেন্স ক্লাস এর নোটস কমপ্লিট করছিলো স্নেহা । রূপম এসে পাশে বসলো , " আচ্ছা শোন তোকে না একটা কথা বলার ছিল। ই এ মানে ইফ ইউ ডন'ট মাইন্ড। " স্নেহা মনে তখন উথাল-পাথাল চলছে, তবে কি রূপম তাকে প্রপোস করবে। নাকি কিছু ফাজলামি মারবে । রূপম কিছু বলার আগেই অঙ্কিত আর পীযুষ ক্লাসএ ঢুকে পড়লো।
অঙ্কিত বললো: "কি ভাই আমাদের ছাড়াই প্ল্যান হচ্ছে নাকি ?" রূপম একটু বিরক্ত হলো ,সেটা কে বিন্দু মাত্র না চেপে বললো " হ্যা, বানাচ্ছি তোর কি রে সব ব্যাপার নাক না গলালে চলে না।" তারপর নিজেই উঠে চলে গেলো। অঙ্কিত , পীযুষ , স্নেহা তিন জন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

২

**"তোমার চোখের ভেতর যাই
হাত দেখিয়ে ট্রেন থামাই"**

রাত তখন একটা।

হাডকো মোড়ে গাড়ি নিয়ে সিগন্যাল দাঁড়িয়ে রয়েছে সাগ্নিক। এমনিতে রাস্তা এখন প্রায় ফাঁকা। তবে সিগন্যাল ভাঙলেই আবার ফাইন ভরতে হবে। হাজার একটা নকশ।

হঠাৎ একটা পাথর এসে তার গাড়ির রিয়ার-ভিউ মিররটায় আঘাত করলো। চট করে মাথা গরম হয়ে যায় তার।

গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে তাকাতেই খানিকটা দূরে একটা কালো হুডি পরা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।বুঝতে অসুবিধা হয় না, কাজটা ওই লোকটারই।

সকালবেলা হলে হয়তো লোকজন জড়ো করে দু-চার ঘা দিত তাকে। কিন্তু এই গভীর রাতে, এই গরমে হুডি পরে দাঁড়িয়ে থাকা পাগলের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর কোনো ইচ্ছে হলো না তার।

বিরক্ত মুখে সে ফিরে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ঠিক তখনই—

পেছন থেকে তীব্র একটা আঘাত অনুভব করল স। কী ঘটল, তা বোঝার আগেই চারপাশটা কেমন ঝাপসা হয়ে উঠতে লাগল।

২

“তোমার বুকের ভেতর যাই
খাঁচায় রাখা লালন সাঁই”

কলেজ ছুটি হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ফোনটা বেজে ওঠে। স্ক্রিনে ভেসে ওঠে রূপমের নাম। তাড়াহুড়ো করে স্নেহা ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে ভেসে আসে রূপমের গলা—

"হ্যালো, ব্যস্ত আছিস?"

স্নেহা নিজের উত্তেজনা যতটা সম্ভব চেপে রেখে বলে,

"না, বল।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকে রূপম। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে,

"তোকে একটা দরকারি কথা বলব, সামনাসামনি। আজ রাত ন'টার দিকে দেখা করতে পারবি?"

স্নেহার পেটের ভেতর যেন একসঙ্গে হাজারটা প্রজাপতি ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। এতদিন ধরে যেটার জন্য সে অপেক্ষা করেছে, সেটা কি অবশেষে ঘটতে চলেছে? যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় সে জিজ্ঞেস করল,"কোথায়?"

রূপম একটা জায়গার নাম বলল। মূল রাস্তা থেকে একটু ভেতরে, পুরনো গুদামের পাশের ফাঁকা জায়গা। দিনের বেলায়ও সেখানে খুব একটা লোকজন থাকে না। রাতে তো আরও নির্জন। তবে স্নেহার মাথায় তখন জায়গাটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসে না। তার সমস্ত মনোযোগ আটকে আছে অন্য এক সম্ভাবনায়। তাছাড়া জায়গাটা হোস্টেলের খুব দূরেও নয়।

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বিছানায় বসে থাকে সে। অকারণেই মুখে হাসি লেগে থাকে। আলমারি খুলে একের পর এক জামা বের করতে থাকে। কোনটা পরলে ভালো লাগবে? খুব বেশি সাজলে কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? আবার একেবারে সাধারণ থাকলেও কি ঠিক হবে?শত প্রশ্নের ভিড়ে সে প্রায় ভুলেই যায় যে হোস্টেলের গেট রাত ন'টা পনেরোতেই বন্ধ হয়ে যায়।

এক শহর আশা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে রাত নটার ।

গ

“লুকোনো আঘাত,
রক্তপাত থামে না কেন”

তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনটি খুন।

ঋত্বিকের মাথা প্রায় খারাপ হয়ে গেছে। উপর থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে। তার ওপর এই মিডিয়ার একশোটা প্রশ্ন। আধা-জানা ইনফর্মেশনের ওপর ভর করে ওরা এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে ঋত্বিকের মাথা গরম হয়ে যায়। কেস যেন সলভ করা ছেলের হাতের মোয়া! আরে, স্বয়ং ব্যোমকেশ আর ফেলুদার সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাগত কেস সলভ করতে। সে তো তবু এক মামুলি পুলিশ অফিসার।

যাইহোক, একেবারে যে সে এগোতে পারেনি তা কিন্তু নয়। এটা যে সিরিয়াল কিলিং, সেটা প্রায় পরিষ্কার। তিনটে মৃতদেহই শনাক্ত করা গেছে। সেই ঘৃণা, যেটা ঋত্বিক প্রথম মৃতদেহটার ওপর দেখে আঁতকে উঠেছিল, সেটি বাকি তিনটেতেও যথেষ্ট স্পষ্ট। তবে একটা ব্যাপার বদলাচ্ছে।

প্রথম মৃতদেহের মুখে ছিল চারটে দাগ।দ্বিতীয়টার তিনটে।তৃতীয়টার দুটো। কোনো কাউন্টডাউন?

ঋত্বিক ধরতে পারছে না।

যদি কাউন্টডাউন হয়, তাহলে আর কি একটা খুন বাকি? নাকি আরও একটা, যেটাতে থাকবে শূন্য?

আরও কিছু ব্যাপার সে বের করেছে।

প্রথম মৃতদেহ—রুদ্রনীল \চৌধুরী।দ্বিতীয়—উন্মেষ রায়।তৃতীয়—সাগ্নিক পাল।

তিনজনেই একই কলেজে পড়ত। সাউথ কলকাতার ল কলেজ।

আজকের দিনে এই সূত্র টুকুই যথেষ্ট সেদিনই বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ঘাটাঘাটি করে আরো বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেলে ঋত্বিক। আর সেখান থেকেই পাওয়া গেল দুটো নাম।পীযুষ ঘোষ আর অঙ্কিত দত্ত ।

ঔ

“চারিদিকে তার অন্ধকার চেপে ধরেই”

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজেকে দেখে স্নেহা। অতিরিক্ত কিছু নয়।একটা হলুদ চিকোনকারী কুর্তি। কানে ছোট্ট দুল। সামান্য লিপস্টিক। চুলটা আরেকবার ঠিক করে নিল। তারপর নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

আজ সে কেন এত নার্ভাস?

মোবাইলের স্ক্রিনে সময় দেখল।৮:৫৩।

আর দেরি করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

রাস্তাগুলো আজ অদ্ভুত ফাঁকা। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। পুরোনো গুদামটা অন্ধকারে আরও বেশি নির্জন দেখাচ্ছে। স্নেহা স্কুটারটা দাঁড় করিয়ে চারপাশে তাকাল।

কোথাও রূপম নেই।

প্রথমে বিশেষ কিছু মনে হলো না।হয়তো একটু দেরি হচ্ছে।

৯:০৭

৯:১৪

৯:২২

শেষমেশ ফোনটা বের করে কল করল।একবার। দুবার।তিনবার।প্রতিবারই রিং হয়ে কেটে গেল। রূপম ফোন তুলল না।হালকা বিরক্ত হয়ে আবার চারপাশে তাকাল স্নেহা।

ঠিক তখনই—

পেছন থেকে একটা শব্দ।সে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই মাথার পেছনে তীব্র এক ব্যথা অনুভব করল। মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে উঠল।

রাস্তার আলো,গুদামের দেয়াল,স্কুটার সব কেমন অন্ধকার এ মিশে গেলো।

৩

“মানব জনম হবে খতম অপার হয়ে”

ছেলেটি নিজের হাতে লেগে থাকা রক্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।তার কাজটা বড়ই নৃশংস, কিন্তু অদ্ভুত আরামদায়ক। যখন তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে, নিজেদের জীবনের ভিক্ষে চায়, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আস্তে আস্তে তাদের প্রাণটা কেড়ে নেয়। তখন সে ফেটে পড়ে এক অমানবিক অট্টহাসিতে।

বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে,সে তার অস্ত্রটা বড়ো যত্নে তুলে রাখে। সে খেতে বসে ,আজ মা রাতে চিকেন কষা আর রুটি বানিয়েছে।

ঘ

“তোমার মাথার ভেতর যাই
শুকনো পাতায় আগুন জ্বালাই”

পীযুষ আর অঙ্কিত চলে যাওয়ার পরে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। ঋত্বিক বুঝতে পেরেছিলো খুনির মোটিভ তার ঘৃণার কারণ। সে যে ডেডাকশন টা করেছিল সেটা ঠিক , ওই মুখের ওপর দাগ গুলো আসলেই কাউন্টডাউন।,তবে একটা খুন এখনো বাকি আছে।

টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মৃতদের ছবি, ফরেনসিক রিপোর্ট, কল রেকর্ড আর কলেজের পুরোনো গ্রুপ ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো ।

রুদ্রনীল।উন্মেষ।সাগ্নিক।

আর চতুর্থ জন। উত্তর টা জানে ঋত্বিক।

পীযুষের কথাটা আবার কানে ভেসে উঠল

"আমাদের চার জনের গ্রুপ ছিল; স্নেহা, রুপম অঙ্কিত আর আমি। রূপম একটা বাজে নেশায় ঢুকে গেছিলো ই-এ মানে জুয়ার নেশাতে। অনেকবার বারণ করার চেষ্টা করেছিলাম, ও কিছুতেই আমাদের কথা মানতো না বাবা বড়লোক ছিল কিনা কুড়ি পঞ্চাশ হাজার টাকা হারা-জেতা ওর কাছে মাইনে রাখতো না। ওরা ৪ জন মাইল খেলতো জুয়া। কিন্তু শেষের দিকে ব্যাপারটা টাকা সীমিত ছিল না। ওরা স্নেহা কে "

গলা শুকিয়ে এলো পীযুষের। ঋত্বিক জলের গ্লাস টা ওরদিকে এগিয়ে দিয়েছিলো। কোনো কেস হয়নি।

অঙ্কিত বলেছিলো ;"করেছিল স্নেহার মা, বাবা। কিন্তু এই দেশে টাকা থাকলে মানুষ সব কিনে নিতে পারে ।"
ঋত্বিক ভ্রু কুঁচকে ফাইলের পাতা উল্টাল। হঠাৎই তার চোখ চলে গেল খুনের লোকেশনগুলোর দিকে।
এস. এন. ব্যানার্জী রোড।
ইডেন গার্ডেন্স।
হাডকো মোড়।
জায়গা গুলোর ইনিশিয়াল গুলো নিলে একটা নাম তৈরী হচ্ছে না। পীযুষ বলেছিলো যে যে কোটা জায়গাতে খুন হয়েছে সেগুলো তে প্রায় যেত স্নেহা। কোনো ক্লাস বা কেবল আড্ডা দিতে।
এস এন ই হ
এ অক্ষর টা বাকি মানে এ দিয়ে এমন একটা জায়গা যেখানে।
ঋত্বিক এক ঝটকায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।
"অবশ্যই..."
সে সহেলি কে মেসেজ পাঠিয়ে দিল যে রাত বারোটার সময় ,তারা দুজনে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের সামনে থাকা "আমাদের চা" - এর ঠেকে যাবে। রাত বারোটা নাগাদ তারা ব্যাকআপ নেবে তবে সেটা দাঁড়িয়ে থাকবে বেশ খানিকটা দূরে। স্পট ই বেশি পুলিশ থাকলে খুনি সতর্ক হয়ে যাবে।

৪

“জ্বলে পুড়ে যাক,
মৌমাছি চাক ভাঙেনা কেনো”

আবারো এক বিরক্তিকর অন্ধকার রাত। তবে এই বিরক্তির কারণ কি আসলেই অন্ধকার না কি নিস্তব্ধতা। স্ট্রিট লাইট এর ম্লান এল কিছু তাই অধকার কাটাতে পারছে না।

সেই ছেলেটি বেরিয়ে পড়েছে তার পরবর্তী লক্ষ্যএর দিকে। পিঠে কালোর ওপর লাল দোর কাটা একটি ব্যাগ। হাতে কালো গ্লাভস। এবং এই প্রচন্ড গরম এ ও একটা কালো হুদি। আজ তার কাজের দিন।

৫

“এতোটা সময়,
অচেনা ভয় ছাড়েনা যেন”

অরূপমের অনেক দিনের অভ্যাস। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু হাঁটাহাঁটি। আজ ডিনারটা করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবে তাতে তার রুটিনের বিশেষ হেরফের হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের পুরোনো কলেজের সামনে এসে পড়ল। সেখান থেকে তার বাড়ি আর বেশি দূরে নয়। একবার ভাবল, সামনের চায়ের দোকানটা পর্যন্ত ঘুরে আসবে। যদিও রাত তখন প্রায় বারোটা পঁয়তাল্লিশ। দোকান অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবু বাইরে রাখা বেঞ্চিগুলো এখনও রয়েছে।

গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল সে। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিল।

রাতটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ। তার মনে হলো, সে একা নয়। ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে একটা কালো হুডি পরা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে।

রূপমের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

"কে... কে আপনি?"

কোনো উত্তর এল না। শুধু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেটা হাতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে।

রূপম উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারল না। তার পেটের এপার ওপর কি একটা যেন চলে গেলো। সে প্রবল যন্ত্রনায় মস্তিতে লুটিয়ে পড়লো।

রূপম কাপ কাপ গলায় বলে উঠলো, "প্লিজ ছেড়ে দিন আমায়। আপনার যা যা লাগবে আমি আপনাকে দিয়ে দেব।"
ছেলেটা হঠাৎ হেসে উঠল। একটা ঠান্ডা, অস্বস্তিকর হাসি।
তারপর নিচু গলায় বলল, "স্নেহার কথা মনে আছে? ফেরত দিতে পারবি ওকে।"
রূপমের মুখ রক্ত শূন্য হয়ে গেল, "আমি! আমি কিছু করিনি..."
"করোনি?" ছেলেটার হাসিটা আরও চওড়া হয়ে উঠল।
রূপম পেটের ক্ষততে হাত দিয়ে চিৎকার করে বললো, "ছেড়ে দিন আমায়। কেউ আছেন? প্লিজ বাঁচান।"
ঠান্ডা রিন্ রিনে গলায় ছেলেটি বললো, "কথাগুলো কেমন শোনা শোনা লাগছে না? স্নেহাও তো বলছিল তোদের ওকে ছেড়ে দিতে, দিয়েছিলিস?"
রূপমকে আর একটা কথাও বলতে দিলো না। জম্মে থাকা সব রাগ যেন উগরে দিলো রূপমের ওপর।ছেলেটি চিৎকার করে বলতে লাগলো, "আরে ভালোবাসতো রে স্নেহা তোকে। সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতো তোকে।"
এই বলে সে এক টান এ ছুরি চালিয়ে দিলো ওর মুখের ওপর দিয়ে।
তখনই পেছন থেকে শব্দ করে একটা বুলেট গাড়ি এসে থামলো নামলো পুলিশ অফিসার ঋত্বিক আর সহেলি। বন্দুকটা ছেলেটির দিকে সোজা তাক করে ঋত্বিক বললো ," বৃথা পালানোর চেষ্টা করবেন না। ইউ আর আন্ডার এররেস্ট। "

ঙ

“তুমি দেখছো তাকে ভাবছো যাকে সে আসল মানুষ নয়”

ইন্টারোগেশন রুমে টেবিলের একদিকে বসে আছে অফিসার ঋত্বিক, আর অপর প্রান্তে হুডি পরা ছেলেটি।মাথার ওপর জ্বলতে থাকা একমাত্র সাদা আলোটা ছেলেটির মুখের অর্ধেকটা আলোকিত করেছে, বাকিটা ডুবে আছে ছায়ায়। কোণায় বসানো ক্যামেরার লাল আলোটা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে, আর পুরো ঘরজুড়ে তৈরি করেছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

ঋত্বিক এর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, ও বলল,"ধরা তো পড়েই গেছ, এবার হুডিটা খুলে ফেলুন।"

কয়েক সেকেন্ড এর নিস্তব্ধতা,তারপর ধীরে ধীরে ছেলেটি মাথা থেকে হুডিটা সরাল।

ঋত্বিক চুপ করে তাকিয়ে রইল,"চারটে খুন। এত পরিকল্পনা। এত ঘৃণা। কেন তা সামান্য হলেও আন্দাজ করতে পারছি, তবে তুমিই কেন সেটা ধরতে পাচ্ছি না "

ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি কিছুক্ষণ টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল,

"আপনার কি কোনো বোন আছে, অফিসার?"

ঋত্বিক কোনো উত্তর দিলো না।

ছেলেটি আবারো বললো "ধরুন আছে।আপনি ব্যাঙ্গালোরে থাকেন বলে ওর সঙ্গে প্রায় রোজই ফোন কথা হয়ে । প্রথমে দু-চার মিনিট আপনার খবর নিত, তারপর শুরু হয়ে যেত একটা ছেলের গল্প। আজ সে কী বলেছে, কী করেছে, ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, ছেলেটা কী শার্ট পরে এসেছিল, তার পারফিউমের গন্ধটা কত ভালো, সে কী খেতে ভালোবাসে—সব। প্রথম প্রথম ভীষণ বিরক্ত লাগত। মনে হতো, পৃথিবীতে আর কোনো বিষয় নেই নাকি! কিন্তু ধীরে ধীরে আপনারও মনে হতে শুরু করল, ছেলেটা হয়তো অতটা খারাপ নয়।

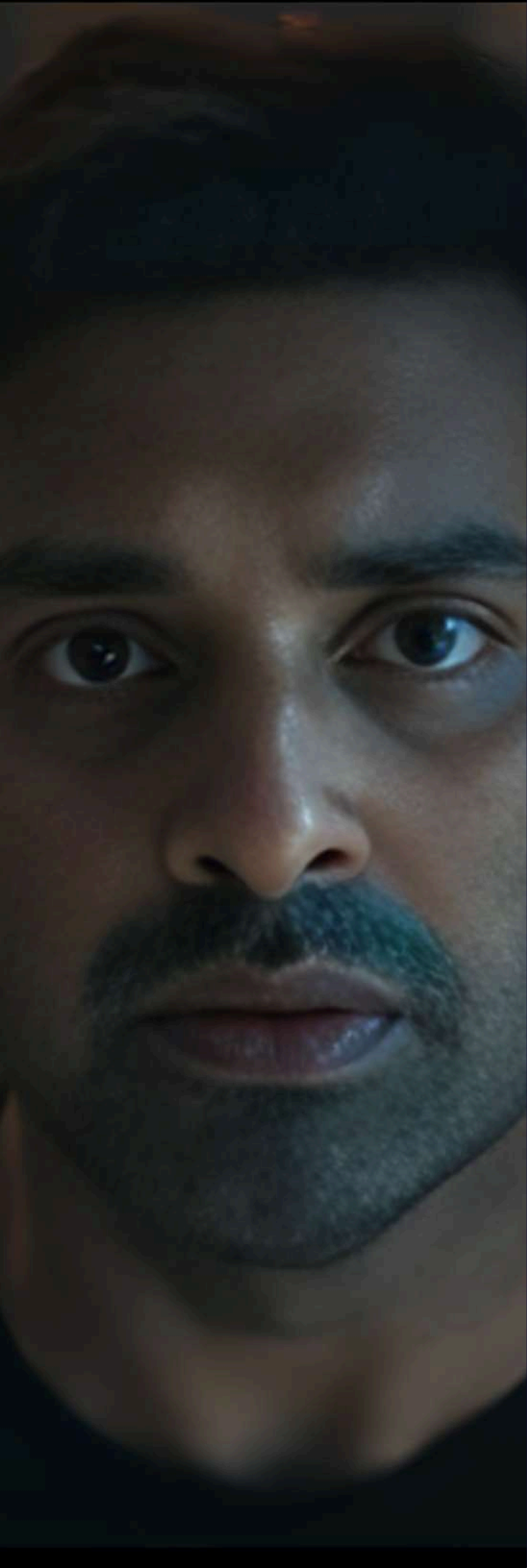

আপনার বোন যে তাকে ভালোবাসে, সেটা বুঝতে আপনার খুব একটা অসুবিধা হয়নি। প্রথম দিকে একটু খিটখিট করলেও পরে আপনি ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন। মা-বাবাকে না জানালেও আপনাকে কিন্তু সব বলত সে। তারপর একদিন ফোন করে বলল, "দাদা, মনে হয় আজ ও আমাকে প্রপোজ করবে।" আপনি হেসে ফেলেছিলেন। এতদিন ধরে যার কথা শুনে আপনার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়, সে অবশেষে প্রপোজ করতে চলেছে। আপনি নিশ্চিন্তে ওকে যেতে বলেছিলেন। তারপরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি অপেক্ষা করছিলেন ওর ফোনের। ভাবছিলেন, কাল রাতে কী হলো, সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে। কিন্তু ওর ফোন আর আসেনি।

আসে আপনার মায়ের ফোন। ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে এক ক্ষীণ কান্না ভেজা কাঁপা কাঁপা গলায় কয়েকটা কথা—"বাবু... রুপুকে ... ওরা..."।"

ছেলেটির গলাটা প্রথমবার একটু কেঁপে উঠল।

ঋত্বিকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা হলো।

"মা বাকিটা শেষই করতে পারেনি।"

সে একবার চোখ বন্ধ করল। কিছুটা সময় নিয়ে আবার বললো

"হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে বসে আপনি অসহায়। নিজেকে ক্রমাগত দোষারোপ করে চলেছে যে আপনার আপনার জন্য আপনার বনের এই অবস্থা। বারবার, বারবার, বারবার একই প্রশ্ন মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে।

কেন?কেন?কেন সেদিন ওকে যেতে দিয়েছিলাম?

কেন বলেছিলাম, "যা, দেখা করে আয়"?

কেন বলেছিলাম, "রূপম ভালো ছেলে"?

প্রতি সেকেন্ডে আপনাকে যেন আরো একটু একটু করে ভেঙে দিছিলো।

আপনার জন্যই ও গিয়েছিল।আপনার জন্যই ও বিশ্বাস করেছিল।আর যখন ওর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন আপনি কিস্সু করতে পারলেন না ।

জানেন আমি ব্যাঙ্গালোর রে থাকতাম বলে ও আমাকে রাখি পড়াতে পারতো না কিন্তু কোনোদিন রাখি পাঠাতে মিস করে নিজের হাত বানিয়ে রাখি পাঠাতো। কখন ভিডিও কল করবো সেই অপেক্ষায় সেজে-গুঁজে সকাল বেলা থেকে অপেক্ষা করতো। ভাইফোঁটা তে বাড়ি না গেলে সে কি রাগ । নিজের বোনের রক্ষা তো করতে পারলাম না। ছোট্ট বেলা তে ও দুস্টুমি করলে মা এর হাত থেকে ওকে বাঁচানোর দায়িত্ব ছিল আমার । কোনোদিন কাউকে ওর গায়ে হাত তুলতে দিয়েই নি। আমি যখন ক্রিকেট খেলে হাত পা কেটে বাড়ি ফিরতাম ; মায়ের কাছে যাতে ঝাড় না খায় তাই ও পায়ে ডেটল লাগিয়ে দিতো। স্কুলে "মাই হিরো" টপিক এ যখন সবাই নিজের বাবার কথা বলছে তখন ও গর্ভ করে বলছে "মাই ব্রাদার ইস the বেস্ট ব্রাদার ইন থী ওয়ার্ল্ড।

কেমন এক নিমেষে দেখলেন সব মিথ্যে হয়ে গেলো। কিছু করতে পারলাম না আমি যখন ওই জানোয়ার গুলো আমার বোন কে ধর্ষণ করলো। কিস্সু না। "

ঋত্বিক চুপ।

ছেলেটি আবার বলতে শুরু করলো , " হাল ছাড়িনি আমি দিনের পর দিন কেস লড়েছি ,কিন্তু পয়সা সেই জিনিস টি থাকলে সত্ব খুন মাফ।

তারপর যাদা যাদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম শীজাম্ অহম। পরিত্রানায়া সাধুনাম বিনাশয় চ দুষ্কৃতম। আই ডিসাইডেড টু বি দেয়র নেমেসিস্।

ঋত্বিক একটু সময় নিয়ে জিগাসা করলো তোমার নাম

"সৃজন সেন, স্নেহা সেন এর দাদা।"

উ

“সে বেঁচে আছে শহরের এক কোনে,সে মৃত মানুষের চিৎকার শোনে প্রতিদিন ।”

"প্রমাণের অভাবে অভিযুক্ত রূপম রায়চৌধুরী, উন্মেষ সেন, সাগ্নিক পাল এবং রুদ্রনীল দত্তা বেকসুর খালাস করা হলো।"

বিচারকের হাতুড়ির শব্দে আদালতঘর ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে শুরু করল।

সৃজন একা বসে রইল নিজের চেয়ারে। মাথা নিচু। চোখ দুটো শূন্য। হেরে গেল সে ।সে এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ।

ঠিক তখনই বাইরে হইচই শুরু হলো। সৃজন বাইরে গিয়ে দেখে এটি মধ্যে অনেক লোক জোর হয়েছে। গুঞ্জন শোনা যায় " কেউ চার তোলা দিয়ে লাফ দিয়েছে!"

সৃজনএর পলকের মধ্যে মনে পরে স্নেহা ওর পাশে ছিল ; এখন নেই।

শরীর ঠেলে এগিয়ে যায়। তারপর থমকে যায়।

মাটিতে পড়ে আছে স্নেহা ।সৃজন হাঁটু গেড়ে বসে পরে ওর পাশে।

কাঁপতে কাঁপতে বারবার বলতে লাগল,"বোন প্লিজ... চোখ খোল... প্লিজ, বোন... একবার চোখ খোল...সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস। আমি আছি তো!"

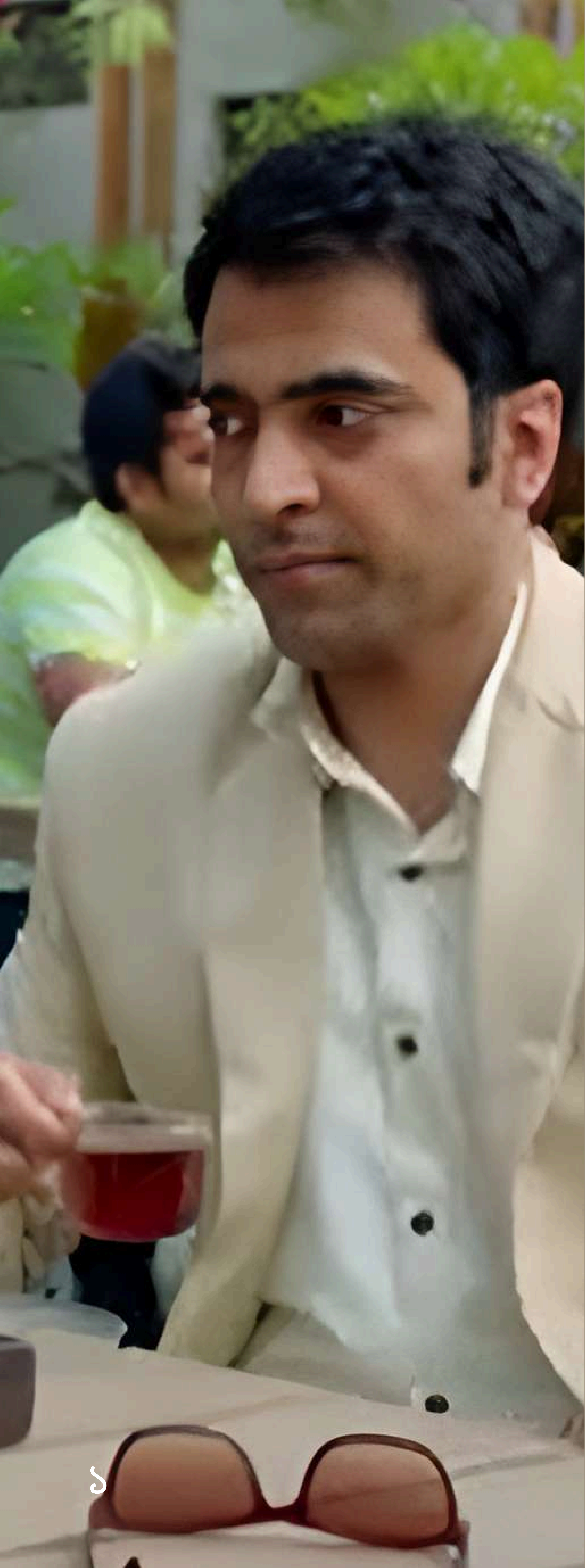

৮

"প্রতিশোধ অভিলাষী
হয়ে বার বার ফিরে ফিরে আসি।"

ক্যাফের ভিতরে টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে আছে ঋত্বিক আর সোহেলী। একজনের হাতে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা, আর অন্যজনের হাতে কোল্ড কফি।কোল্ড কফিতে তৃপ্তির চুমুক দিয়ে সোহেলী ঋত্বিককে বলল,"স্যার, একটা প্রশ্ন করি?"
জবাবে ঋত্বিক হালকা হেসে বলল,"মনে যখন এসেছে, করে ফেলো।"
সোহেলী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল,"স্যার, আপনি তো জানতেন আগের খুনগুলোর মতো এটাও রাত একটা নাগাদ হবে। তাহলে ফোর্সকে ১:১০-এ ঢুকতে বলেছিলেন কেন?"
ঋত্বিক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মৃদু হেসে বলল,
"পুলিশের সবচেয়ে বড় বিফলতা কী জানো, সোহেলী? আইনের রক্ষক হয়ে , আমরা আইনের মুখোশ পড়ে মাঝে মাঝে সত্যর সাথে আপস করেফেলি। এবার নয় আমি একটু আইনের বাইরে গিয়ে ঠিক কাজটাই করেছি।"
সোহেলী চুপ করে শুনছিল। ঋত্বিক এর ঠোঁটের কোণে একটা ক্লান্ত হাসি দেখা যায় । সে বলে ,"এমনিতেও, সব মানুষ বেঁচে থাকার যোগ্য হয় না।"

"আমি সেই মানুষটা আর নেই |"

“বাড়িয়ে দাও তোমার হাত
আমি আবার তোমার
আঙুলে ধরতে চাই”

তথ্য ফাঁস

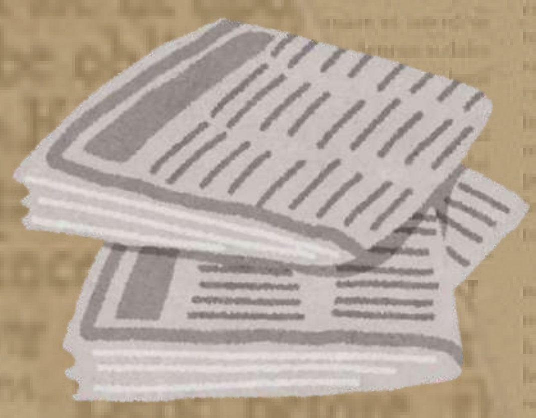

আদিত্য বললে,
শুনেছিস রে বন্ধু?
"দিনকাল খারাপ ভীষণ,
তথ্য উড়ে বেড়ায় বাতাসে
এখন!"

চমকে উঠে বলে
বন্ধু অবাক চোখে—
"তথ্য উড়ে মানে?
সে আবার কেমন শোকে?"

আদিত্য হেসে বলে—
"মোবাইলের ওই পর্দায়,
ছবি, কথা, নাম ঠিকানা
সব জমে অজানা ঘরদোরায়।

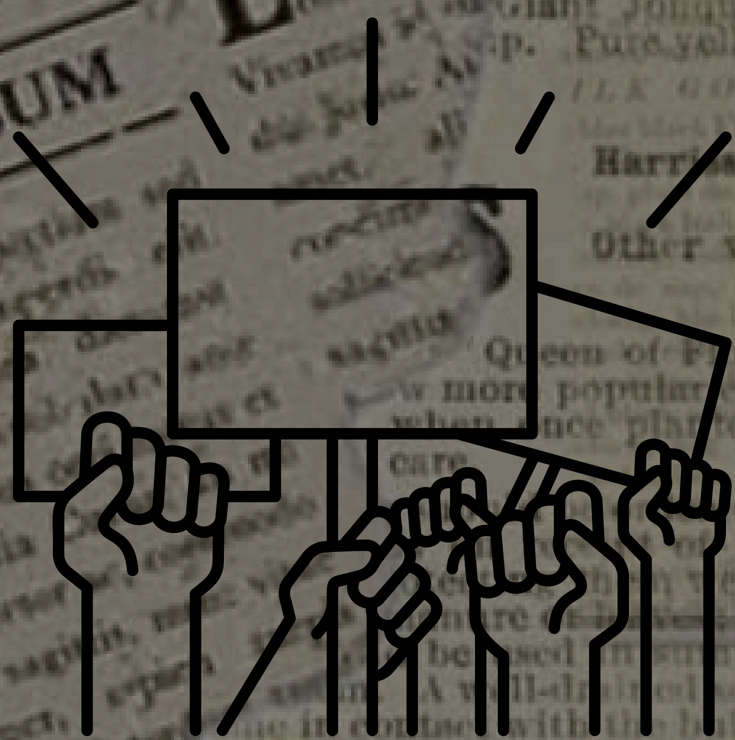

একদিন হঠাৎ খবর এল,
গোপন দরজা ভাঙা—
হাজার মানুষের পরিচয়
পড়ে রইল রাস্তায় ছড়ানো।

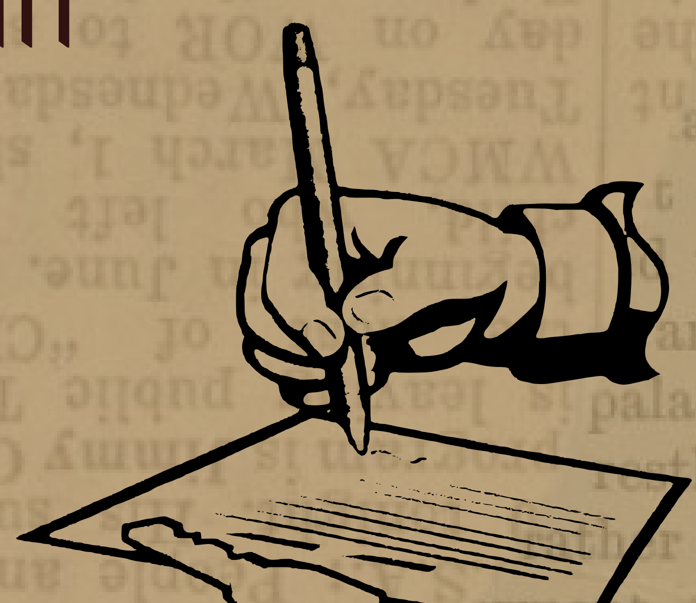

বন্ধু বলে ভারী গলায়—
“তাই তো ভাবি মাঝে মাঝে,
যা লিখি আর যা দিই ভাগ
সব কি থাকে নিরাপদ সাজে?”

আদিত্য বলে, “তাই তো রে,
সাবধানে চলা চাই—
ছোট্ট ভুলেই কখন যে
বিপদ এসে দাঁড়ায় ঠাঁই।”

বন্ধু তখন হাসি হেসে
মৃদু স্বরে কয়—
“সতর্কতার আলো জ্বাললে
ভয়টা দূরেই রয়।”

পর্দার এই অদ্ভুত জগৎ
রঙিন যতই হোক,
মনে রাখতে হবে তবু
গোপনতারও আছে শোক।

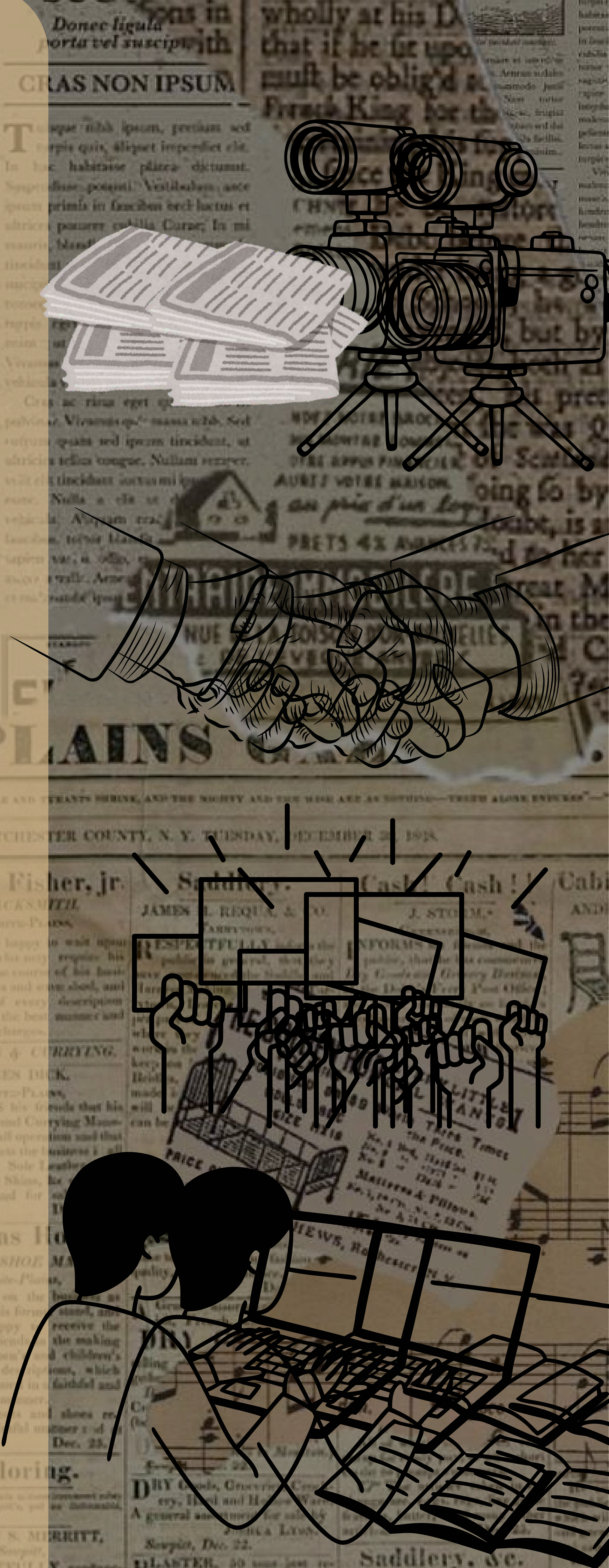

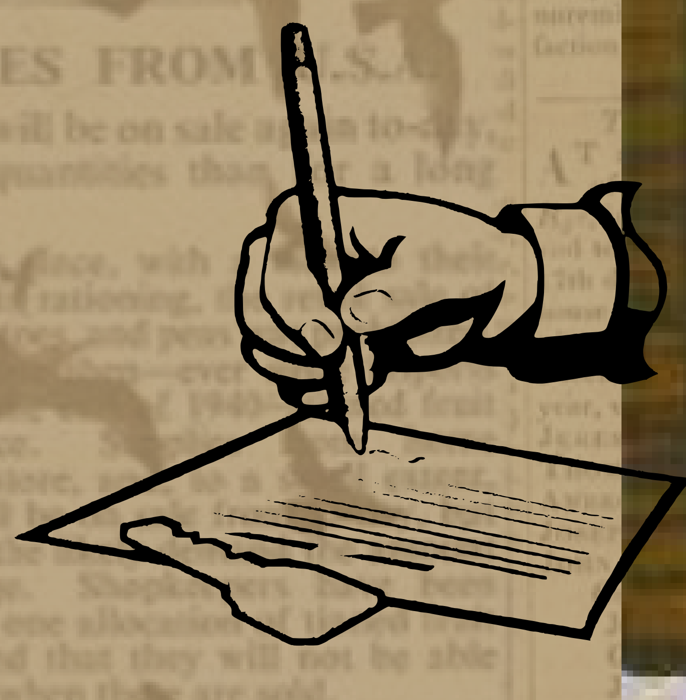

মানুষের
আঁকা শহর

কলকাতা একসময় খুব ধীরে জাগত—গঙ্গার কুয়াশার ভেতর, ঘুমচোখে ট্রামের ঘণ্টা শুনে, ছাপাখানার প্রথম কাগজের শব্দে। তখন শহরের সকাল মানে ছিল অপেক্ষা, ছিল নীরবতা, ছিল সময়। আজ কলকাতা জাগে হঠাৎ, আলোয় ঝলসে, স্ক্রিনের শব্দে। সেই ধীর সকাল আর ফেরে না। যে শহর একদিন ভাবতে জানত, আজ সে শুধু দৌড়ায়। পুরনো কলকাতা কোথাও বিদায় নেয়নি—সে কেবল চাপা পড়ে গেছে কংক্রিটের নিচে, ভুলে যাওয়া নামের ভিড়ে, স্মৃতির ভারে নুয়ে পড়ে। এই শহর এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু তার হৃদয় যেন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতা ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, আর ১৭৭২ সালে

এটি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। তখন থেকেই শহরের রাস্তা, ভবন, নাম—সবই নতুন করে আঁকা হতে থাকে। ডালহৌসি স্কোয়ার, হারিসন রোড, চৌরঙ্গি—এই নামগুলির মধ্যে ক্ষমতা ছিল, কিন্তু আত্মা ছিল না। স্বাধীনতার পরে শহর নিজের নামগুলো ফেরত নিতে চেয়েছে—ডালহৌসি স্কোয়ার হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, হারিসন রোড হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড। নাম বদলানো ছিল প্রয়োজন, কিন্তু নামের সঙ্গে যে সময়টা জড়িয়ে ছিল, সেই সময়টাকে আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। কলকাতা একদিন ছিল চিন্তার শহর। ১৭৭৮ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি এখানেই ভারতের প্রথম

ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে গড়ে ওঠে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮১৪ সালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, আর ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই শহর থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল নবজাগরণ, যুক্তি, প্রশ্ন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস (১৮০০) এবং বটতলার ছাপাখানাগুলি সাধারণ মানুষের হাতে বই তুলে দিয়েছিল। আজ বই আছে, তথ্য আছে, কিন্তু সেই গভীর মনোযোগ, সেই নীরব পড়া—সব যেন ফিকে হয়ে গেছে।

শিল্প একসময় কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্পকেন্দ্র। ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট গঠিত হয়, হুগলি নদী দিয়ে চলত বাণিজ্য। একসময় শুধু জুট মিলেই কাজ করতেন লক্ষাধিক শ্রমিক। ১৮৯২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস ছিল ভারতের প্রথম সফল স্বদেশি শিল্প উদ্যোগ। আজ শিল্পের মানচিত্র বদলেছে—অনেক মিল বন্ধ, অনেক চিমনি নিঃশব্দ। উন্নয়ন এসেছে অন্য পথে, কিন্তু সেই শ্রমিক জীবনের সম্মিলিত স্পন্দন আর ফেরেনি। উত্তর কলকাতার বড় বাড়িগুলো একদিন হাসত। লম্বা বারান্দা, ভিতরের উঠোনে আলো-ছায়া, এক বাড়িতে বহু প্রজন্ম। আজ সেই বাড়িগুলোর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে বা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বহুতল উঠেছে—আরাম এসেছে, আধুনিকতা এসেছে। কিন্তু সঙ্গে এসেছে নিঃসঙ্গতা। প্রতিবেশী আর চেনেনা প্রতিবেশীকে। আকাশ ছোট হয়ে এসেছে। তবু কিছু জিনিস এখনও টিকে আছে, যেন জেদ করে। ১৮৭৩ সালে চালু হওয়া কলকাতা ট্রাম,
এশিয়ার প্রাচীনতম—আজও ধীরে চলে, যেন সময়কে অস্বীকার করে। ১৯৪৩ সালে তৈরি হাওড়া ব্রিজ, প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের ভার বহন করে—নীরবে। ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া কলকাতা মেট্রো, ভারতের প্রথম—শহরকে গতি দিয়েছে, সময় বাঁচিয়েছে। ২০০১ সালে “ক্যালকাটা” থেকে “কলকাতা” নাম পরিবর্তন শহরের ভাষা ও আত্মপরিচয়কে সম্মান দিয়েছে। এগুলো অগ্রগতি, নিঃসন্দেহে।কিন্তু অগ্রগতির মাঝেও কিছু হারিয়ে গেছে—ধীরে কথা বলা শহরটি দ্রুত কথা বলতে শিখেছে, গভীরতা কমেছে। স্মৃতি এখন ছবিতে বন্দি, দেয়ালে নয়। কলকাতা আজও বাঁচে, কিন্তু সে আর আগের মতো অনুভব করে না। কলকাতা নকশা তাই কোনো মানচিত্র নয়। এটি ক্ষয়ের, সংগ্রামের, পরিবর্তনের এক বিষণ্ন দলিল। এখানে উন্নয়ন আছে, কিন্তু তাতে ক্লান্তি লেগে আছে। এখানে ইতিহাস আছে, কিন্তু অনেকটা নীরব। এই শহর আজও দাঁড়িয়ে আছে—ভাঙা স্মৃতি নিয়ে, চোখে জল নিয়ে—যেন নিজেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে একদিন কী ছিল।

কৌশিকী গোস্বামী
রক্তবীজ
২

অরিত্রর বয়স এখন পঁচিশ। বেঙ্গালুরুর এক বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করে সে। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা, ডেডলাইন, মিটিং, আর নিরন্তর ব্যস্ততা তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। শহরটা দ্রুত, চঞ্চল, আর নির্দয়ভাবে এগিয়ে চলা—ঠিক তার নিজের জীবনটার মতোই। কিন্তু অরিত্রর শিকড় পড়ে আছে বহু দূরে, এক ছোট্ট শহরের পুরোনো বাড়িতে।

মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা-মাকে হারায় সে এক দুর্ঘটনায় তারপর থেকে তাকে মানুষ করেছে তার দাদু-দিদা আর বাড়ির এক বিশ্বস্ত পরিচারক, হারুকাকা। দিদার কোলে মাথা রেখে ঘুমোনো, দাদুর সঙ্গে বিকেলে গল্প শোনা, আর হরুকাকুর হাতের

গরম ভাত—এইসব দিয়েই গড়ে উঠেছিল তার ছোটবেলা।

কিন্তু সেই আশ্রয়ও বেশিদিন টেকেনি। অরিত্র তখন স্কুলে পড়ে, হঠাৎ করেই দিদা চলে গেলেন। বাড়িটা যেন এক লহমায় ফাঁকা হয়ে গেল। দাদু তখন থেকে আরও চুপচাপ হয়ে যান, আর হারুকাকু নিঃশব্দে সংসারের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অরিত্র বড় হলো, পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য পাড়ি দিল বেঙ্গালুরুতে। নতুন শহর, নতুন জীবন,সবকিছুই বদলে গেল। শুধু একটাই জিনিস বদলাল না,দাদুর সঙ্গে তার সম্পর্ক।

দাদু ফোন ব্যবহার করতে জানতেন না। তাই অরিত্র চিঠি লিখত। দীর্ঘ, বিস্তারিত চিঠি।তার অফিসের গল্প, নতুন বন্ধুদের কথা, কখনো আবার নিছক নিজের একাকিত্বের কথা। দাদুও জবাব দিতেন কাঁপা হাতে লেখা অক্ষরে ছোট

ছোট বাক্যে ভরা, কিন্তু গভীর স্নেহে পূর্ণ।আর প্রতি বছর, একটাই সময় অরিত্র কোনোভাবেই মিস করত না —দুর্গাপুজো।

ওই সময়টা যেন তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। পুরোনো বাড়িতে প্রতি বছর ধুমধাম করে পুজো হত, আলোর সাজ, ধুনোর গন্ধ, ঢাকের আওয়াজে ভরে উঠত চারদিক। দাদু নিজে তদারকি করতেন সবকিছু, আর হারুকাকু রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকতেন নানান পদের রান্নায়। বেঙ্গালুরুর ব্যস্ততা, অফিসের চাপ সবকিছুকে পেছনে ফেলে অরিত্র ফিরত সেই বাড়িতে। একদিন অফিসের ব্যস্ততার মধ্যেই অরিত্র একটা চিঠি পেল। দাদুর কাঁপা হাতে লেখা অক্ষরগুলো যেন আগের চেয়ে আরও অস্পষ্ট, আরও দুর্বল।চিঠিতে দাদু লিখেছেন—

প্রিয় দাদুভাই,

আমার শরীর খুবই খারাপ । জানি না হাতে আর কটা দিন। তোকে যদি শেষ বারের মতো আর একবার দেখতে পেতোম মন টা জুড়িয়ে যেত। আমি জানি তোর অনেক বেস্ততা তবুও যদি প্যারিশ হাতে দু তিন দিন সময় নিয়ে তোর এই বুড়ো দাদু টাকে শেষ বারের মতো একবার দেখে যা ।

ইতি,
তোর দাদু।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অরিত্রকে ফিরে আসতে বললেন। তাঁর মনে হচ্ছে সময় খুব বেশি নেই, শেষ ক’টা দিন নাতির সঙ্গে কাটাতে চান।

চিঠিটা পড়ে অরিত্রর মনটা ভারী হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার বন্ধুদের সঙ্গে গোয়া যাওয়ার একটা প্ল্যানও ছিল—অনেকদিন ধরে ঠিক করা, বহু প্রতীক্ষিত একটা ট্রিপ। দ্বিধায় পড়ে গেল সে। একদিকে দায়িত্ব, টান আর ভালোবাসা; অন্যদিকে বন্ধুত্ব আর নিজের একটু মুক্তির সময়।শেষ পর্যন্ত সে সবকিছু খুলে বলল তার বন্ধুদের। পরিস্থিতিটা বোঝার পর তারা একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল—গোয়া

নয়, এবার তারা সবাই মিলে যাবে অরিত্রর গ্রামের বাড়িতে। শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিন কাটানো—এটাও তো এক অন্যরকম অ্যাডভেঞ্চার।

কয়েকদিনের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল সেই পুরোনো বাড়িতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই যেন সময় থমকে গেল অরিত্রর জন্য। দরজা খুলে তাদের স্বাগত জানালেন হারু কাকা। অরিত্রকে দেখে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

“বাবু! তুই এলি অবশেষে! কত বড় হয়ে গেছিস রে.. এই বুড়ো চোখে তোকে আর দেখতে পাব না ভেবেই ভয় পাচ্ছিলাম,”—কাঁপা গলায় বললেন তিনি।

অরিত্র এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। “কাকা, আমি তো আছিই.. এত সহজে কোথাও যাচ্ছি না।”

তারপর সে গেল দাদুর ঘরে। বহুদিন পর মুখোমুখি দেখা। কথোপকথনটা ছিল গভীর, নীরবতার মধ্যেও ভরপুর অনুভূতিতে।দাদু যেন জীবনের সব অভিজ্ঞতা,ভালোবাসা আর আশীর্বাদ তুলে দিতে চাইলেন অরিত্রর হাতে।

আর অরিত্র, সব শুনতে শুনতে বুঝতে পারছিল—সময় সত্যিই খুব কম।

দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। হারু কাকাও তাদের সঙ্গে। খাওয়ার টেবিলে হাসি-আড্ডা জমে উঠল। হারু কাকা একের পর এক গল্প বলতে লাগলেন—ছোটবেলার দুষ্টুমি, দিদার কাছে বকুনি খাওয়া, দাদুর সঙ্গে পুজোর প্রস্তুতি—সবকিছু। অরিত্রর বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, আর অরিত্র নিজেও যেন ফিরে যাচ্ছিল সেই দিনগুলোতে। খাওয়ার পর বন্ধুরা বেরিয়ে গেল আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখতে। সবুজ মাঠ, পুকুর, গাছপালা—সবকিছু তাদের কাছে নতুন আর রোমাঞ্চকর। আর অরিত্র রয়ে গেল দাদুর কাছে, বিকেলটা কাটাল তাঁর সঙ্গে গল্প করে, চুপচাপ বসে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে অরিত্র বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিল—হালকা আড্ডা, হাসি, মজা। ঠিক তখনই হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে এলেন হারু কাকা, মুখে আতঙ্ক স্পষ্ট—"বাবু! তাড়াতাড়ি আয় দাদুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে!"

সবাই ছুটে গেল দাদুর ঘরে। দাদু তখন হাঁপাচ্ছেন, শ্বাস নিতে লড়াই করছেন। অরিত্রকে দেখেই তিনি হাত বাড়িয়ে ডাকলেন। অরিত্র এগিয়ে গেলে তিনি মৃদু গলায় বললেন —"সবাই যে তোর ভালো চায়, তা ন সাবধানে থাকিস.."এই কথাটুকু বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।ঘরের মধ্যে তখন নিস্তব্ধতা নেমে এল। অরিত্র ভেঙে পড়ল, কান্নায় ভেঙে গেল তার বুক। বন্ধুরা তাকে সামলানোর চেষ্টা করছিল, হারু কাকা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, চোখে জল।ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঠাকুরঘরের ঘণ্টা নিজে থেকেই বেজে উঠল। বাইরে কাকের কর্কশ ডাক ভেসে এল একসঙ্গে। ঘরে

উপস্থিত পুরোহিতমশাই হঠাৎ রজার দিকে তাকালেন।

কেউ যেন হেঁটে গেল পাশ দিয়ে। তিনি বাইরে বেরিয়ে দেখলেন—করিডোর জুড়ে রক্তমাখা পায়ের ছাপ, কিন্তু আশেপাশে কেউ নেই। "এ কী অনর্থ!"—চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তিনি ছুটে গেলেন ঠাকুরঘরে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, বহু বছরের পুরোনো কালীমূর্তিটি মাটির মধ্যে আংশিক বসে গেছে, যেন ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। পুরোহিতমশাই বুঝলেন অশুভ কিছু শুরু হয়েছে। কেউ রক্তবীজকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই বাড়ির সবাই বিপদের মুখে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিপদে অরিত্র,কারণ ওই শক্তি এই বাড়িকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে তার রক্তের দরকার।পরের দিন অমাবস্যা। তাই তিনি অরিত্রকে সাবধান করে দিলেন সেদিন যেন সে বিশেষ সতর্ক থাকে। কিন্তু অরিত্র তখন দাদুর মৃত্যুশোকে ডুবে। শেষকৃত্য না করে সে কোথাও যেতে পারবে না।

আর পুরোহিতের কথাগুলোও তার কাছে কেমন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল।দাদুর মৃত্যুর পর বাড়ির পরিবেশটাই যেন বদলে গেল। শোকের সঙ্গে মিশে ছিল এক অদ্ভুত অস্বস্তি—কিছু একটা ঠিক নেই, এই অনুভূতিটা সবাইকে ঘিরে ধরেছিল।

সেই রাতেই হারু কাকা অরিত্রকে আলাদা করে ডেকে নিলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। তিনি কোথা থেকে যেন কিছু তাবিজ, সুরক্ষার সুতো এনে অরিত্রর হাতে পরিয়ে দিলেন।“বাবু, এগুলো সবসময় সঙ্গে রাখবি”—গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।তারপর একটু থেমে আরও নিচু স্বরে বললেন, “একটা কথাও মনে রাখিস—তোর শরীরে যেন একটুও আঁচড় না লাগে। একফোঁটা রক্তও যদি বেরোয়... সেটা খুব বিপদ ডেকে আনতে পারে।”অরিত্র অবাক হলেও তখন কিছু বলেনি।

পরদিন সকালে পুরোহিতমশাই জানালেন—পরের দিন তিনি একটা যজ্ঞ করবেন। সেই যজ্ঞের মাধ্যমে কালীমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখন একমাত্র দেবীই পারেন এই অশুভ শক্তিকে থামাতে।সেদিন দুপুরে হারু কাকা অরিত্রর ছোটবেলার প্রিয় নিরামিষ খাবারগুলো রান্না করলেন। ভাত, ডাল, আলুভাজা, পনির, পায়েস—সবকিছু যেন ঠিক আগের মতোই। খাওয়ার টেবিলে আবার একটু প্রাণ ফিরে এল। বন্ধুরা মজা করে খাচ্ছিল, গল্প করছিল। কিছুক্ষণের জন্য সবাই যেন ভুলেই গিয়েছিল চারপাশে কী ভয়ানক কিছু ঘটছে।কিন্তু বিকেলের দিকে হঠাৎ অরিত্রর এক বন্ধুর পেটব্যথা শুরু হল। গ্রামের মশলাদার খাবারটা তার সহ্য হয়নি। ব্যথা বাড়তে থাকায় শিবম (আরেকজন বন্ধু) ঠিক করল—ওষুধ আনতে যাবে সে। সমস্যা হল, আশেপাশে কোনো ওষুধের দোকান নেই।

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল—প্রায় সাড়ে এগারোটা। বাড়ির ভেতর থেকে তখন অদ্ভুত এক মন্ত্রোচ্চারণ আর আচার-অনুষ্ঠানের শব্দ ভেসে আসছিল। সে একটু অবাক হল—এত বড় কিছু হচ্ছে, আর কেউ তাকে জানাল না?কৌতূহল আর অস্বস্তি নিয়ে সে শব্দের দিকে এগিয়ে গেল।

উঠোনে পৌঁছে সে যেন জমে গেল।

মাঝখানে যজ্ঞবেদি, তার সামনে বসে আছে হারু কাকা। বেদির ওপারে অরিত্র শুয়ে আছে—অচেতন। চারপাশে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুরা, কিন্তু তারা যেন নিজেদের মধ্যে নেই—এক অদ্ভুত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় "কাসর-ঘণ্টা" বাজাচ্ছে। সে চুপিচুপি এক বন্ধুকে নেড়ে জাগানোর চেষ্টা করল—কোনো সাড়া নেই। যেন তারা সম্পূর্ণভাবে কারও নিয়ন্ত্রণে।হঠাৎ তার মনে পড়ল—একটা তান্ত্রিক বইয়ে সে পড়েছিল এই ধরনের যজ্ঞের কথা। সেখানে বলেছিল, বলি দেওয়ার কিছু নির্দিষ্ট শর্ত থাকে।

তার মধ্যে একটি—বলির শরীরে কোনো রকম ক্ষত থাকা চলবে না। যদি থাকে, তাহলে যে যজ্ঞ শুরু করেছে, তাকেই বলি হিসেবে গ্রহণ করে সেই শক্তি।

সে ঘড়ির দিকে তাকাল। সময় প্রায় বারোটার কাছাকাছি। ঠিক বারোটায় সেই শক্তি আবির্ভূত হবে—তাকে নিখুঁত সময়েই কিছু করতে হবে। ঠিক তখনই সে শুনতে পেল হারু কাকা অচেতন অরিত্রর দিকে তাকিয়ে বলছে—

“তোর দাদুটা বড়ই জেদি ছিল। ভালোয় ভালোয় যদি সম্পত্তিটা দিয়ে দিত, তাহলে এসব করতে হত না। তা না, সব তোকে দিয়ে গেল, আর ভাবল সব বলে দেবে! বলে না—অতি চালাকের গলায় দড়ি। ঠিক হয়েছে, ওর খেলা শেষ করেছি। এবার তোর পালা.. তারপর এইসব আমার.. সব আমার হবে!”

সব পরিষ্কার হয়ে গেল।সময় এসে গেছে।

শিবম পকেট থেকে একটা ছোট কাটার বের করল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে অরিত্রর হাতে হালকা করে কেটে দিল।

একফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল।

হারু কাকা রেগে আগুন। তাঁর চোখ রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল—এখন রক্তবীজ তার দিকেই আসবে।

ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজল।

চারপাশের অন্ধকার যেন ঘন হয়ে উঠল। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক বিকৃত, ভয়ংকর আকৃতি—মুখভর্তি রক্ত, চোখে অমানুষিক ক্ষুধা।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল হারু কাকার দিকে।হারু কাকা পালানোর চেষ্টা করলেন—কিন্তু যত দূরই যান, সেই দানব যেন ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কোনো পথ নেই, কোনো রক্ষা নেই।

তারপর শুরু হল এক ভয়াবহ পরিণতি—দানবটি তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল, এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে তাকে গ্রাস করল।

কিছুক্ষণ পর সব শান্ত হয়ে গেলযজ্ঞের আগুন ধীরে ধীরে নিভে এল। বন্ধুরা একে একে স্বাভাবিক চেতনায় ফিরল, যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

শিবম সবকিছু খুলে বলল। কীভাবে সে বুঝেছিল, কীভাবে শেষ মুহূর্তে সে অরিত্রকে বাঁচিয়েছে।

অরিত্র নিঃশব্দে সব শুনল। তখনই তার মনে পড়ল দাদুর শেষ কথা—

“সবাই যে তোর ভালো চায়, তা নয়..”

পরদিন সকালে কালীমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল যজ্ঞের মাধ্যমে।

অরিত্র সিদ্ধান্ত নিল—সে আর এখানে থাকবে না। এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক স্মৃতি, কিন্তু এখন সেই স্মৃতির মধ্যে ভয় মিশে গেছে।সব গুছিয়ে, নিজের আর পরিবারের জিনিসপত্র নিয়ে, বাড়িটা এক অনাথ আশ্রমকে দান করার পরিকল্পনা নিয়ে সে বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে গেল বেঙ্গালুরুতে।

আর কোনোদিন সে ফিরে তাকায়নি সেই বাড়ির দিকে।

ভূতের সাথে দেখা
রহিম প্রধান

পড়তে বসে হঠাৎ আমি পেলাম একটি শব্দ ভাবলাম যে দাদা
আমায় করতে চাইছে জব্দ।
পরে, আমার মাথায় এল, দাদা গেছে ঘুরতে,
তাহলে কি ভূত এসেছে, অন্য পাড়া থেকে!
আওয়াজ যেন চিঁ চি র মতো লাগছে আমার কানে,
সবার কাছে শুনেছি যে ভুতরা নাকি আঘাত হানে।
শরীর আমার ভয়তে ভাই থরথর কাপল,
ভীষণ ঠান্ডা জল যেন কেউ, গায়ে আমার ঢালল।
চিমটি কেটে দেখলাম যে, দেখছি না তো স্বপ্ন।
খানিক বাদে দেখা হলো ভূতের সঙ্গে অল্প।
দেখলাম যে, ভূতটা একটা ছোট্ট ইদুর - ছানা,
ভাবছি তখন সত্যি সত্যি নইতো আমি কানা?
তাড়াতাড়ি দৌড়ে সে যে, পায়ে আমার পড়ল
তখনই আমি চুপিচুপি বলি তাকে হ্যালো মিস্টার হ্যালো
সেই সন্ধ্যায় হল আমার ভূতের সাথে দেখা -
কিন্তু আমার কত যে জ্ঞান ?দিব্যি হল শেখা।

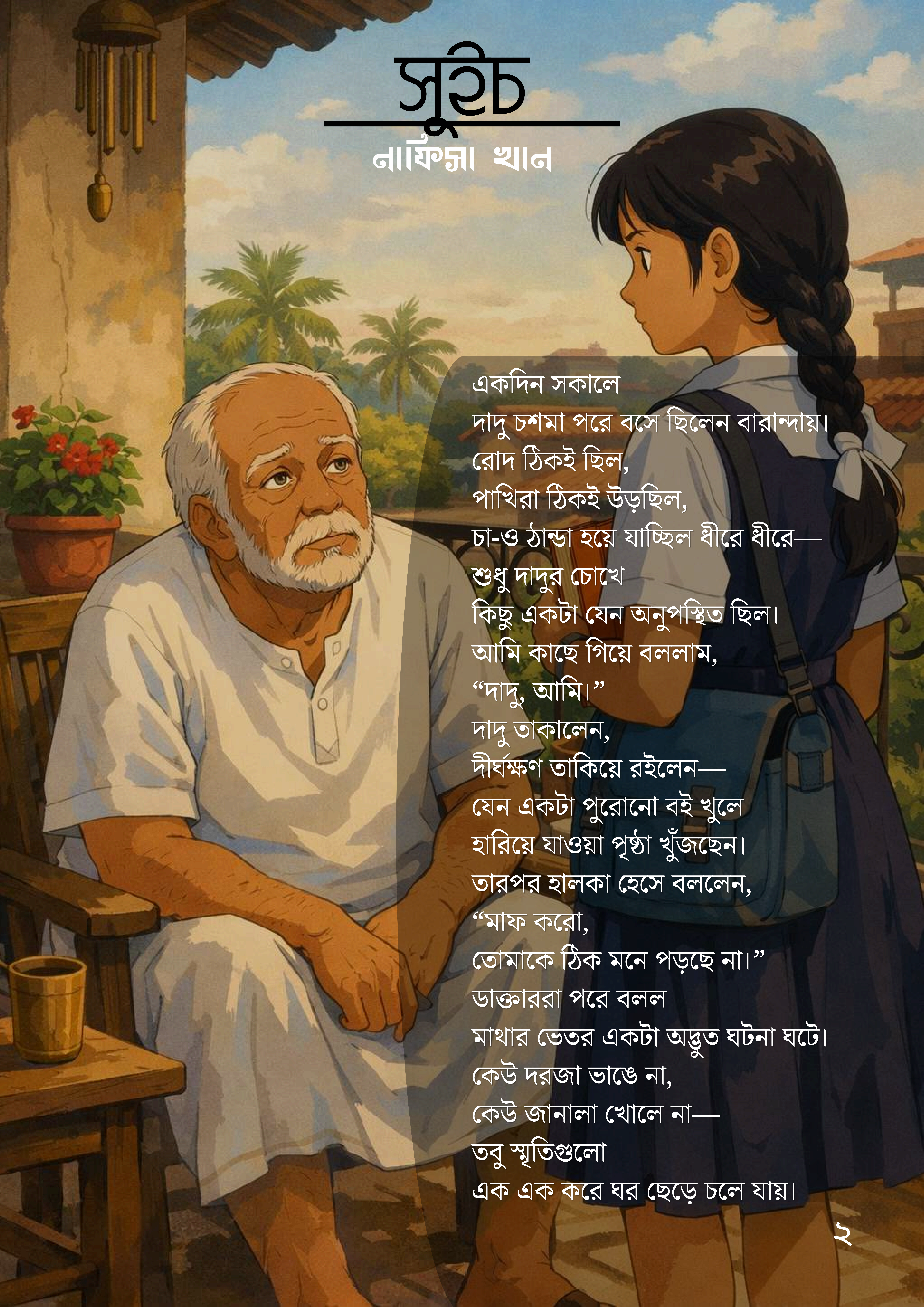

সুইচ

নাফিসা খান

একদিন সকালে
দাদু চশমা পরে বসে ছিলেন বারান্দায়।
রোদ ঠিকই ছিল,
পাখিরা ঠিকই উড়ছিল,
চা-ও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে—
শুধু দাদুর চোখে
কিছু একটা যেন অনুপস্থিত ছিল।
আমি কাছে গিয়ে বললাম,
“দাদু, আমি।”
দাদু তাকালেন,
দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন—
যেন একটা পুরোনো বই খুলে
হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা খুঁজছেন।
তারপর হালকা হেসে বললেন,
“মাফ করো,
তোমাকে ঠিক মনে পড়ছে না।”
ডাক্তাররা পরে বলল
মাথার ভেতর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।
কেউ দরজা ভাঙে না,
কেউ জানালা খোলে না—
তবু স্মৃতিগুলো
এক এক করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

প্রথমে নাম,
তারপর রাস্তা,
তারপর বাড়ির ঘ্রাণ,
তারপর... মানুষ।
এই নীরব চুরির নাম
Alzheimer's disease।
অনেক বছর ধরে
বিজ্ঞানীরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছেন—
কোথায় সেই সুতো
যা টানলেই স্মৃতির জাল ছিঁড়ে যায়।
একদিন তারা দেখলেন
মস্তিষ্কের গভীরে
একটা অদৃশ্য সুইচ আছে।
যেন কেউ ধীরে ধীরে
আলোটা বন্ধ করে দিচ্ছে।

তারা সাহস করে
সেই সুইচে হাত দিল।
একটি ছোট্ট প্রাণীর ভেতরে
আলো আবার জ্বলে উঠল।
ল্যাবরেটরির কাঁচের ঘরে
কিছু স্মৃতি ফিরে এল—
যেন অনেকদিন পরে
ডাকপিয়ন হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ে।
কাগজে লেখা হল নতুন সম্ভাবনা,
সংবাদে উঠল আশার শিরোনাম।

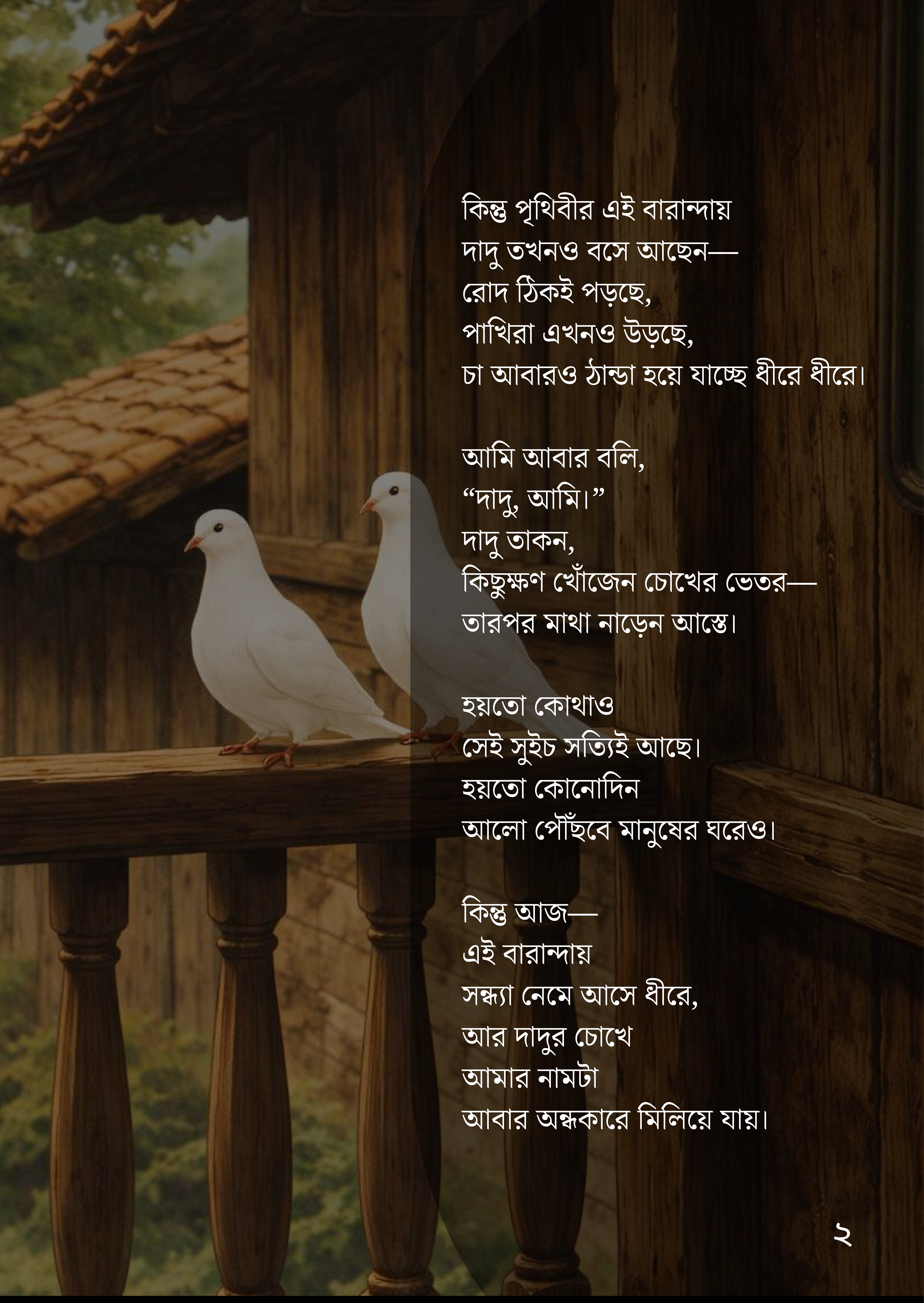

কিন্তু পৃথিবীর এই বারান্দায়
দাদু তখনও বসে আছেন—
রোদ ঠিকই পড়ছে,
পাখিরা এখনও উড়ছে,
চা আবারও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আমি আবার বলি,
“দাদু, আমি।”
দাদু তাকন,
কিছুক্ষণ খোঁজেন চোখের ভেতর—
তারপর মাথা নাড়েন আস্তে।

হয়তো কোথাও
সেই সুইচ সত্যিই আছে।
হয়তো কোনোদিন
আলো পৌঁছবে মানুষের ঘরেও।

কিন্তু আজ—
এই বারান্দায়
সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে,
আর দাদুর চোখে
আমার নামটা
আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কলকাতার নকশা

কলকাতা একসময় খুব ধীরে জাগত—গঙ্গার কুয়াশার ভেতর, ঘুমচোখে ট্রামের ঘণ্টা শুনে, ছাপাখানার প্রথম কাগজের শব্দে। তখন শহরের সকাল মানে ছিল অপেক্ষা, ছিল নীরবতা, ছিল সময়। আজ কলকাতা জাগে হঠাৎ, আলোয় ঝলসে, স্ক্রিনের শব্দে। সেই ধীর সকাল আর ফেরে না। যে শহর একদিন ভাবতে জানত, আজ সে শুধু দৌড়ায়। পুরনো কলকাতা কোথাও বিদায় নেয়নি—সে কেবল চাপা পড়ে গেছে কংক্রিটের নিচে, ভুলে যাওয়া নামের ভিড়ে, স্মৃতির ভারে নুয়ে পড়ে। এই শহর এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু তার হৃদয় যেন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতা ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, আর ১৭৭২ সালে এটি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। তখন থেকেই শহরের রাস্তা, ভবন, নাম—সবই নতুন করে আঁকা হতে থাকে। ডালহৌসি স্কোয়ার, হারিসন রোড, চৌরঙ্গি—এই নামগুলির মধ্যে ক্ষমতা ছিল, কিন্তু আত্মা ছিল না। স্বাধীনতার পরে শহর নিজের নামগুলো ফেরত নিতে চেয়েছে—ডালহৌসি স্কোয়ার হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, হারিসন রোড হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড। নাম বদলানো ছিল প্রয়োজন, কিন্তু নামের সঙ্গে যে সময়টা জড়িয়ে ছিল, সেই সময়টাকে আর ফিরিয়ে আনা যায়নি।

কলকাতা একদিন ছিল চিন্তার শহর। ১৭৭৮ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি এখানেই ভারতের প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে গড়ে ওঠে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮১৪ সালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, আর ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই শহর থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল নবজাগরণ, যুক্তি, প্রশ্ন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস (১৮০০) এবং বটতলার ছাপাখানাগুলি সাধারণ মানুষের হাতে বই তুলে দিয়েছিল। আজ বই আছে, তথ্য আছে, কিন্তু সেই গভীর মনোযোগ, সেই নীরব পড়া—সব যেন ফিকে হয়ে গেছে।

শিল্প একসময় কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্পকেন্দ্র। ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট গঠিত হয়, হুগলি নদী দিয়ে চলত বাণিজ্য। একসময় শুধু জুট মিলেই কাজ করতেন লক্ষাধিক শ্রমিক।

১৮৯২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস ছিল ভারতের প্রথম সফল স্বদেশি শিল্প উদ্যোগ। আজ শিল্পের মানচিত্র বদলেছে—অনেক মিল বন্ধ, অনেক চিমনি নিঃশব্দ। উন্নয়ন এসেছে অন্য পথে, কিন্তু সেই শ্রমিক জীবনের সম্মিলিত স্পন্দন আর ফেরেনি।

উত্তর কলকাতার বড় বাড়িগুলো একদিন হাসত। লম্বা বারান্দা, ভিতরের উঠোনে আলো-ছায়া, এক বাড়িতে বহু প্রজন্ম। আজ সেই বাড়িগুলোর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে বা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বহুতল উঠেছে—আরাম এসেছে, আধুনিকতা এসেছে। কিন্তু সঙ্গে এসেছে নিঃসঙ্গতা। প্রতিবেশী আর চেনে না প্রতিবেশীকে। আকাশ ছোট হয়ে এসেছে। কী ছিল।

তবু কিছু জিনিস এখনও টিকে আছে, যেন জেদ করে। ১৮৭৩ সালে চালু হওয়া কলকাতা ট্রাম, এশিয়ার প্রাচীনতম—আজও ধীরে চলে, যেন সময়কে অস্বীকার করে। ১৯৪৩ সালে তৈরি হাওড়া ব্রিজ, প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের ভার বহন করে—নীরবে। ১৯৮৪ সালে চালু হওয়া কলকাতা মেট্রো, ভারতের প্রথম—শহরকে গতি দিয়েছে, সময় বাঁচিয়েছে। ২০০১ সালে "ক্যালকাটা" থেকে "কলকাতা" নাম পরিবর্তন শহরের ভাষা ও আত্মপরিচয়কে সম্মান দিয়েছে। এগুলো অগ্রগতি, নিঃসন্দেহে।কিন্তু অগ্রগতির মাঝেও কিছু হারিয়ে গেছে—ধীরে কথা বলা শহরটি দ্রুত কথা বলতে শিখেছে, গভীরতা কমেছে। স্মৃতি এখন ছবিতে বন্দি, দেয়ালে নয়। কলকাতা আজও বাঁচে, কিন্তু সে আর আগের মতো অনুভব করে না।

কলকাতা নকশা তাই কোনো মানচিত্র নয়। এটি ক্ষয়ের, সংগ্রামের, পরিবর্তনের এক বিষণ্ন দলিল। এখানে উন্নয়ন আছে, কিন্তু তাতে ক্লান্তি লেগে আছে। এখানে ইতিহাস আছে, কিন্তু অনেকটা নীরব। এই শহর আজও দাঁড়িয়ে আছে—ভাঙা স্মৃতি নিয়ে, চোখে জল নিয়ে—যেন নিজেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে একদিন

ট্রামের ঘণ্টায় ফিরে আসে দিন

মেগান পামার

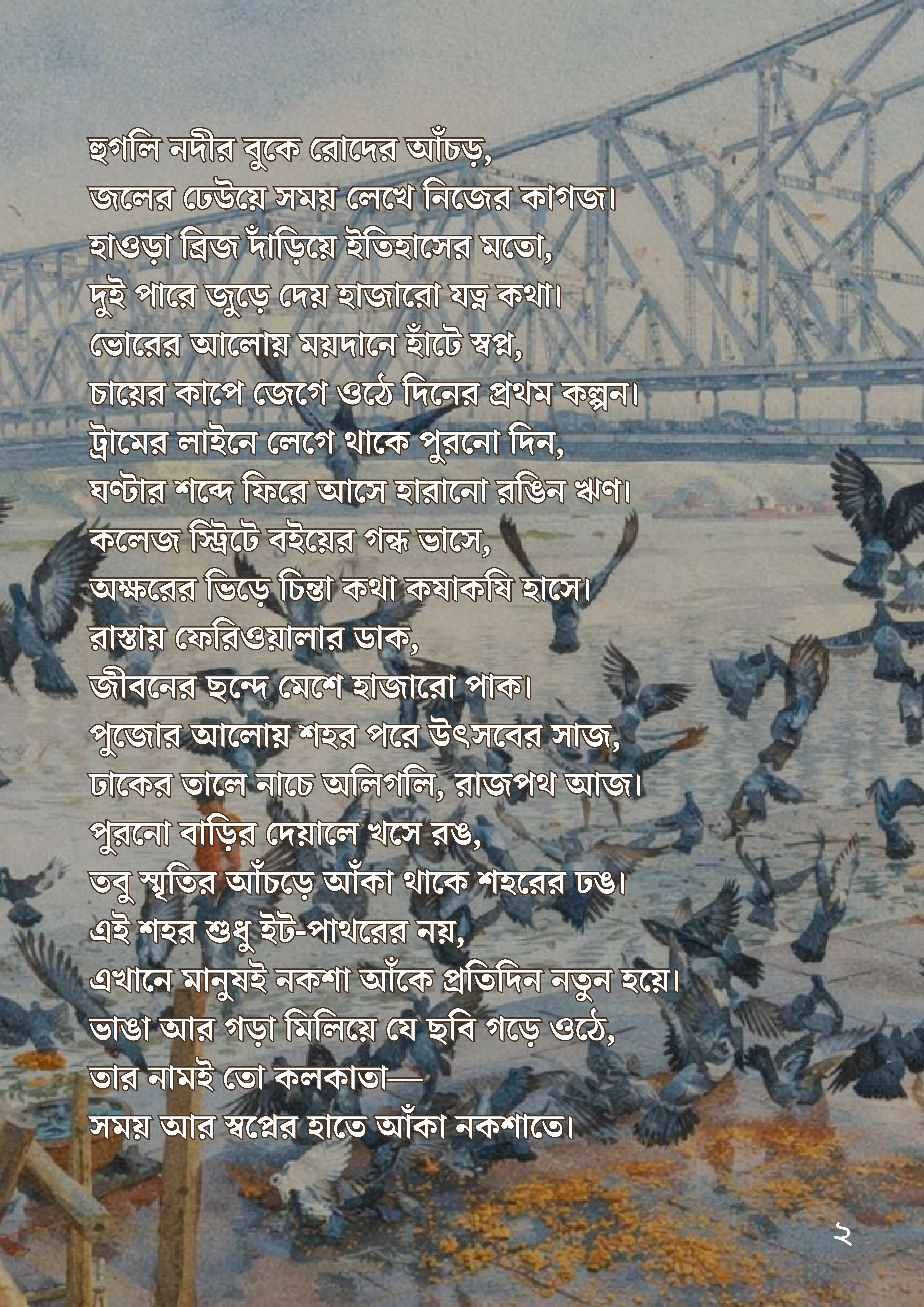

হুগলি নদীর বুকে রোদের আঁচড়,
জলের ঢেউয়ে সময় লেখে নিজের কাগজ।
হাওড়া ব্রিজ দাঁড়িয়ে ইতিহাসের মতো,
দুই পারে জুড়ে দেয় হাজারো যত্ন কথা।
ভোরের আলোয় ময়দানে হাঁটে স্বপ্ন,
চায়ের কাপে জেগে ওঠে দিনের প্রথম কল্পন।
ট্রামের লাইনে লেগে থাকে পুরনো দিন,
ঘণ্টার শব্দে ফিরে আসে হারানো রঙিন ঋণ।
কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের গন্ধ ভাসে,
অক্ষরের ভিড়ে চিন্তা কথা কষাকষি হাসে।
রাস্তায় ফেরিওয়ালার ডাক,
জীবনের ছন্দে মেশে হাজারো পাক।
পুজোর আলোয় শহর পরে উৎসবের সাজ,
ঢাকের তালে নাচে অলিগলি, রাজপথ আজ।
পুরনো বাড়ির দেয়ালে খসে রঙ,
তবু স্মৃতির আঁচড়ে আঁকা থাকে শহরের ঢঙ।
এই শহর শুধু ইট-পাথরের নয়,
এখানে মানুষই নকশা আঁকে প্রতিদিন নতুন হয়ে।
ভাঙা আর গড়া মিলিয়ে যে ছবি গড়ে ওঠে,
তার নামই তো কলকাতা—
সময় আর স্বপ্নের হাতে আঁকা নকশাতে।

আয়েন্দ্রী ঘোষ

সব ভুতুড়ে

অভিষ্কা চ্যাটার্জী

ব্রহ্মদত্যি বললো,
শুনছো হে গিন্নি,
"দিন কাল খারাপ বেজায়, ভয় ডর
সব গেলো চুলোয়"

চিন্তিত হয়ে শোনে
গিন্নি শাকচুন্নি...
বলে শাকচুন্নি
"ভয় পাবেনা মানে ??
মটকে দিলে ঘাড়খানা,
পিলে চমকাবে প্রাণে "...

ব্রহ্মদত্যি বলে "ছাতার মাথা !!
ওই সুখেই থাকো
ভূত চতুর্দশীর একটিদিন
আছে তো মাত্র..
ভয় কোথায়? হাসি - মজায় আমরা
যেন অবহেলার পাত্র..

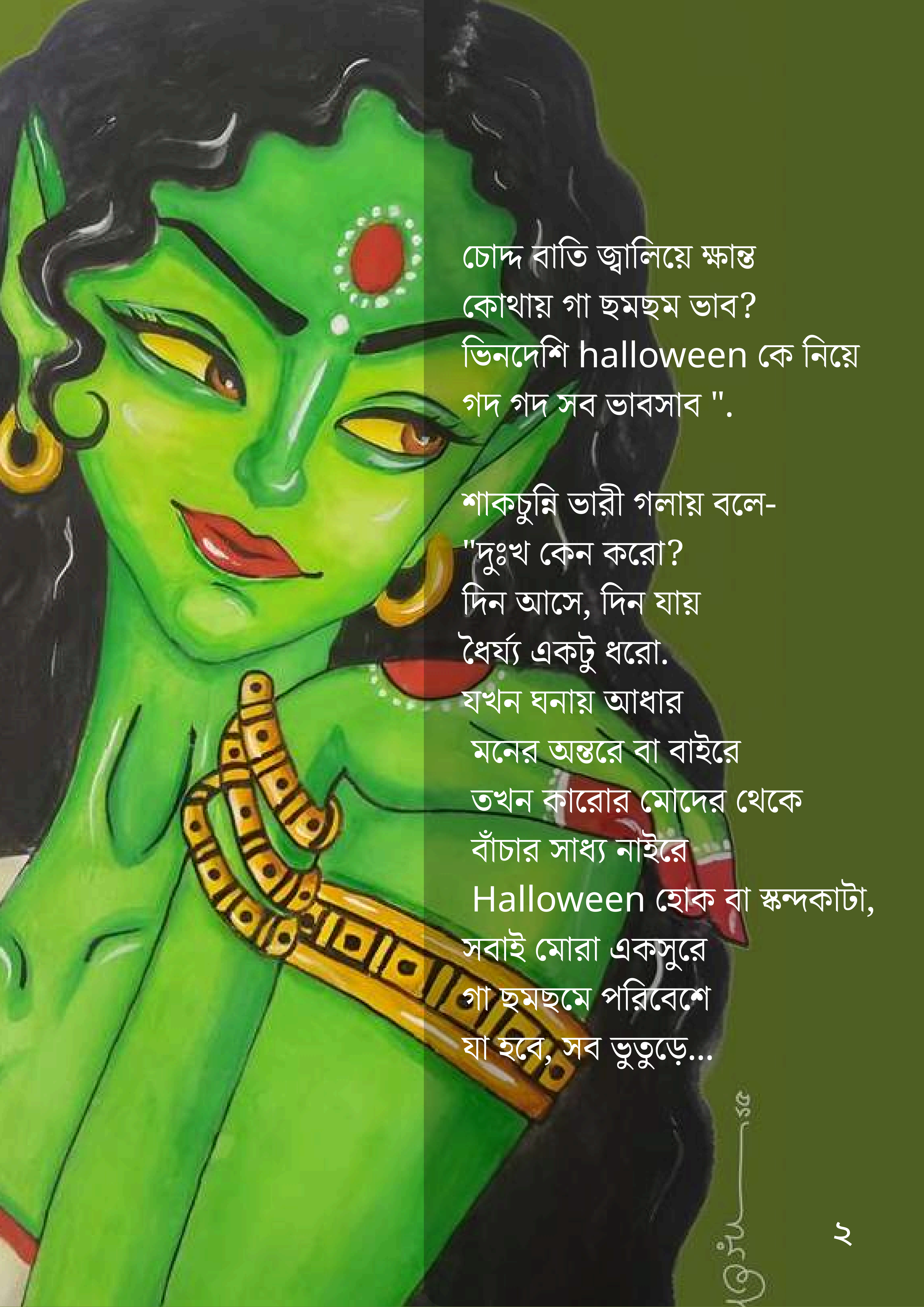

চোদ্দ বাতি জ্বালিয়ে ক্ষান্ত
কোথায় গা ছমছম ভাব?
ভিনদেশি halloween কে নিয়ে
গদ গদ সব ভাবসাব ".

শাকচুন্নি ভারী গলায় বলে-
"দুঃখ কেন করো?
দিন আসে, দিন যায়
ধৈর্য্য একটু ধরো.
যখন ঘনায় আধার
মনের অন্তরে বা বাইরে
তখন কারোর মোদের থেকে
বাঁচার সাধ্য নাইরে
Halloween হোক বা স্কন্দকাটা,
সবাই মোরা একসুরে
গা ছমছমে পরিবেশে
যা হবে, সব ভুতুড়ে...

নকশার ভাঁজে জমে থাকা কান্না

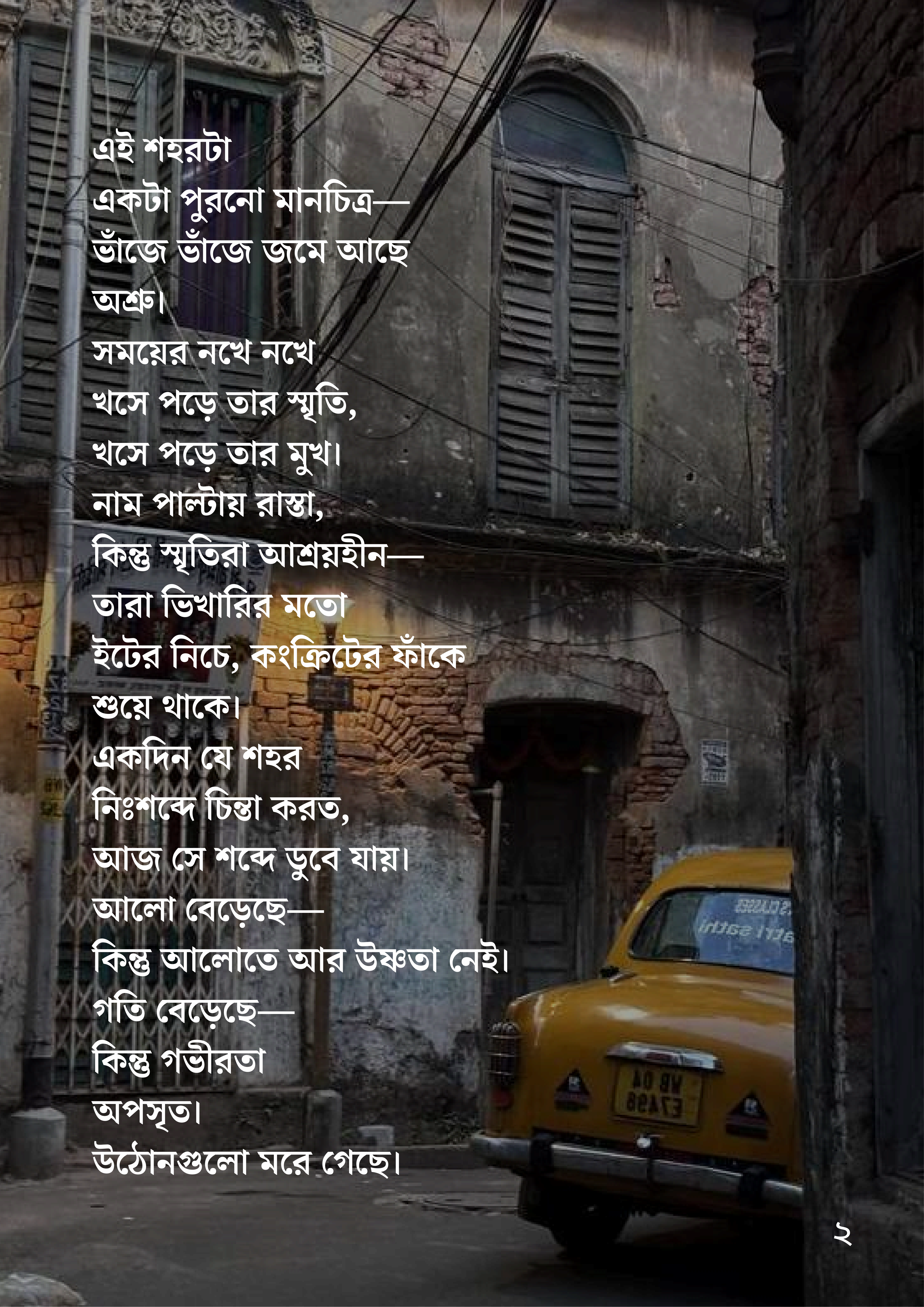

এই শহরটা
একটা পুরনো মানচিত্র—
ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে
অশ্রু।
সময়ের নখে নখে
খসে পড়ে তার স্মৃতি,
খসে পড়ে তার মুখ।
নাম পাল্টায় রাস্তা,
কিন্তু স্মৃতিরা আশ্রয়হীন—
তারা ভিখারির মতো
ইটের নিচে, কংক্রিটের ফাঁকে
শুয়ে থাকে।
একদিন যে শহর
নিঃশব্দে চিন্তা করত,
আজ সে শব্দে ডুবে যায়।
আলো বেড়েছে—
কিন্তু আলোতে আর উষ্ণতা নেই।
গতি বেড়েছে—
কিন্তু গভীরতা
অপসৃত।
উঠোনগুলো মরে গেছে।

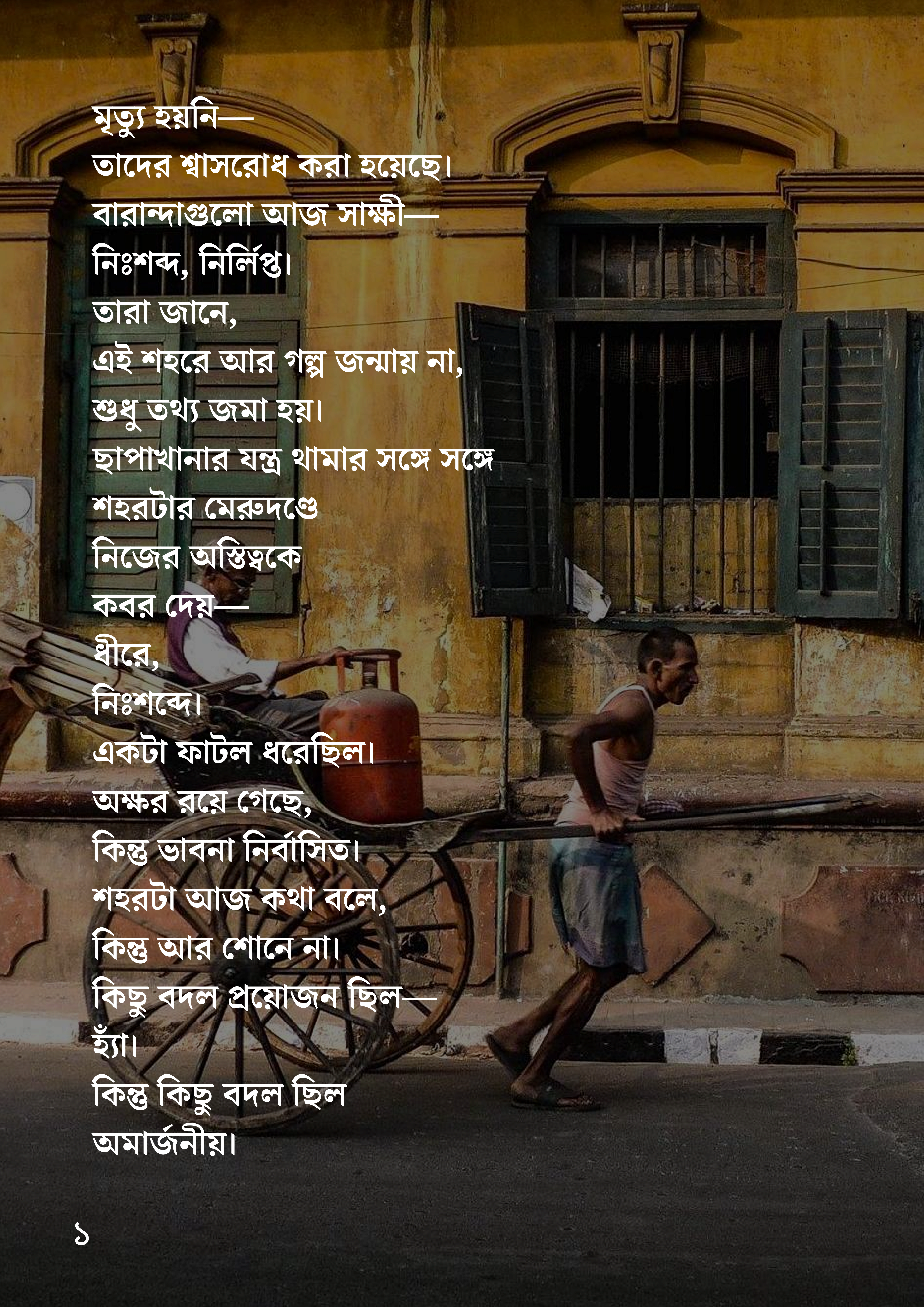

মৃত্যু হয়নি—
তাদের শ্বাসরোধ করা হয়েছে।
বারান্দাগুলো আজ সাক্ষী—
নিঃশব্দ, নির্লিপ্ত।
তারা জানে,
এই শহরে আর গল্প জন্মায় না,
শুধু তথ্য জমা হয়।
ছাপাখানার যন্ত্র থামার সঙ্গে সঙ্গে
শহরটার মেরুদণ্ডে
নিজের অস্তিত্বকে
কবর দেয়—
ধীরে,
নিঃশব্দে।
একটা ফাটল ধরেছিল।
অক্ষর রয়ে গেছে,
কিন্তু ভাবনা নির্বাসিত।
শহরটা আজ কথা বলে,
কিন্তু আর শোনে না।
কিছু বদল প্রয়োজন ছিল—
হ্যাঁ।
কিন্তু কিছু বদল ছিল
অমার্জনীয়।

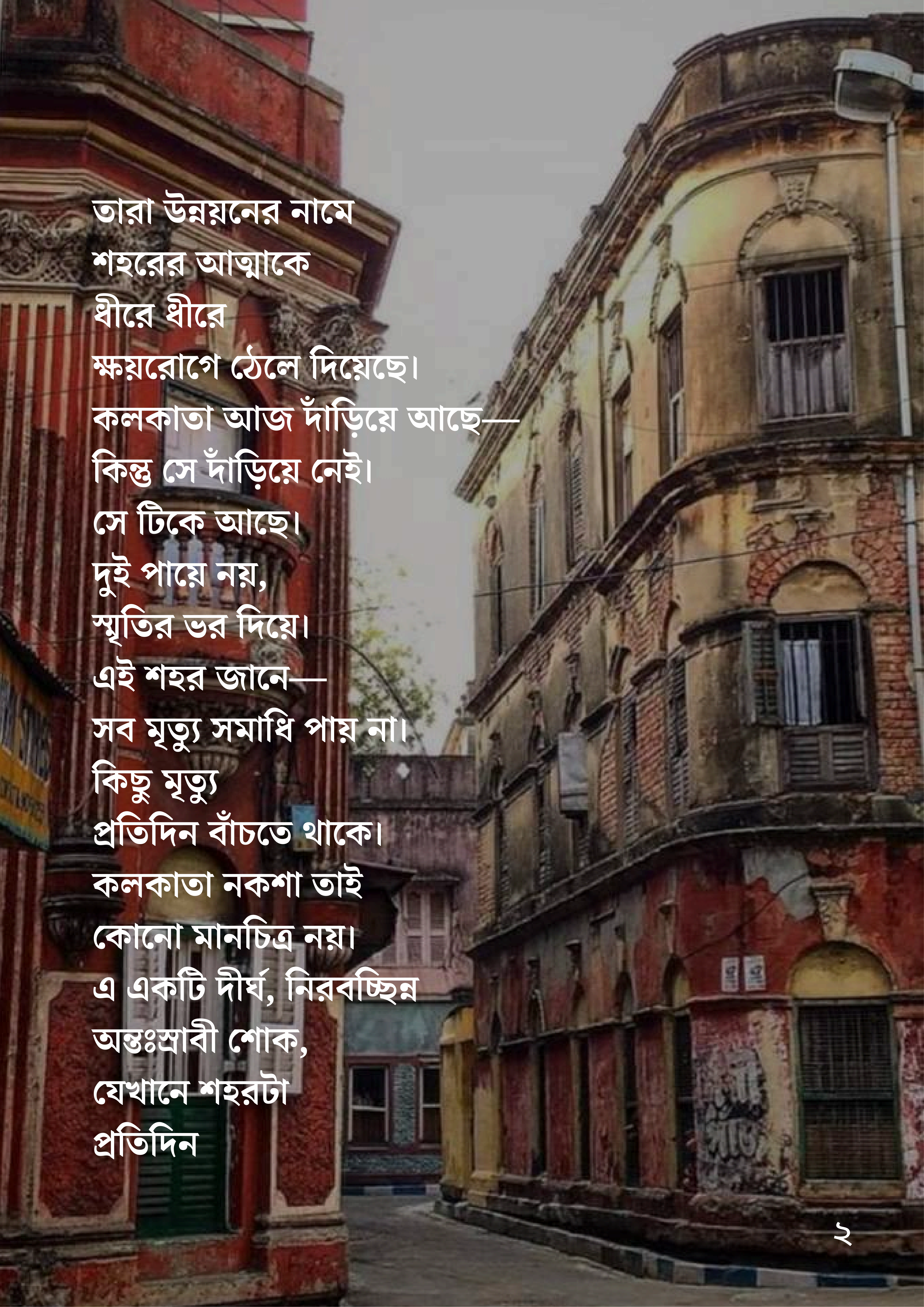

তারা উন্নয়নের নামে
শহরের আত্মাকে
ধীরে ধীরে
ক্ষয়রোগে ঠেলে দিয়েছে।
কলকাতা আজ দাঁড়িয়ে আছে—
কিন্তু সে দাঁড়িয়ে নেই।
সে টিকে আছে।
দুই পায়ে নয়,
স্মৃতির ভর দিয়ে।
এই শহর জানে—
সব মৃত্যু সমাধি পায় না।
কিছু মৃত্যু
প্রতিদিন বাঁচতে থাকে।
কলকাতা নকশা তাই
কোনো মানচিত্র নয়।
এ একটি দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন
অন্তঃস্রাবী শোক,
যেখানে শহরটা
প্রতিদিন

ভূত এসেছে

সেদিন পদ্ম নদীর ঘাটে
যখন সূর্যি গেল পাটে
শেষ হল যে বেলা
আর আঁধার হল মেলা।
আমি এদিক ওদিক চাই
কেউ কোত্থাও নাই
হঠাৎ শুনি সুর
বেতালা ভরপুর
খোনা, হেঁড়ে, নাকী
বুঝতে নেই আর বাকি!
আমি পরাণ নিয়ে হাতে
এই তেপান্তরের মাঠে
যাবই বুঝি মরে
একদম বেঘোরে।
যখন প্রাণ বুঝি বা যায়
হঠাৎ একি ঘটলো হায়
ওঁরা আমায় দেখে
সব গান বাজনা রেখে
দিল দেদার ছুট
চেঁচিয়ে বলে- ভূত এসেছে ভূত।

-শাম্বরী দাশগুপ্ত

অদ্রিজা মান্না

রঙিন চশমা খুললে
সাদা কালো পৃথিবী

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার রণজয় প্রবাসী বাঙালি, ছাত্রাবস্থা থেকেই (ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়) ব্যাঙ্গালোরে বাস বছর দশক হল। বিয়ে হয়েছে শিক্ষিতা-সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী আধুনিকা রিম্পার সাথে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার পর মিষ্টি মেয়ে "বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনি" থেকে হিরের টুকরো "স্মার্ট", "হ্যান্ডসাম", "শিক্ষিত", বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান রণজয়কে বিবাহ করে। রিম্পার বাবা-মাও তার একমাত্র মেয়েকে 'শ্বশুর শাশুড়ির' ঘর করতে হবে না, প্রথম থেকেই স্বাধীন ও গতিশীল 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির' অধিশ্বরী করতে পেরে বেশ নিশ্চিন্তে।

বছর দুয়েক হল তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে — রিয়ান। রিম্পা রণজয়কে খুব যত্ন করে, দুজনে যেন অনেক জন্মের জুটি। রণজয় প্রতিটি সপ্তাহান্তে রিম্পাকে নিয়ে ছোটখাটো জায়গায় ঘুরে আসে। এবার ওরা একটা 'বাংগালো বুক' করেছে। রিম্পা আর রণজয়ের কখনও মতান্তর হয় না — দুজনে দুজনকে চোখে হারায়। সকালে একসাথে জলখাবারের পর রণজয় অফিস যায়, রিম্পা চলে যায় জিম-এ। আধুনিকা রিম্পা—ছেলে সামলানোর জন্য একটি ভালো সহায়িকাও জোগাড় করেছে। বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন চালানো, রূপচর্চায় নিজেকে যুগের তাল মিলিয়ে প্রস্তুত করা, বিউটি কনসেশনস— রিম্পার সারাদিন ব্যস্ততায় কেটে যায়।

কিন্তু ইদানীং রণজয় বলছিল 'এআই' আসছে। টেস্টিং এক্সপার্ট টিম লিড রণজয়ের বউ বলেছিল, "তোমার প্রতিভাকে অন্তত কোম্পানি বুঝবে।" গত মাস দুয়েক হল রণজয় যেন কেমন মনমরা। ঘটে গেল সেই অনভিপ্রেত ঘটনাটা।

একদিন সকালে জলখাবারের টেবিলে হঠাৎ গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ! জ্বলে উঠলো মোবাইলের আলোটা — "নিউ মেসেজ"। লে-অফ এর লিস্টে রণজয়ের নাম— মুহূর্তেই সবকিছু ঝাপসা। "রিম্পা, তুমি আমার পাশে আছ তো?" জিজ্ঞাসা করে রণজয়।

চোখের দামি ফ্রেমের চশমাটা টেবিলের ওপর খুলে রাখতে রাখতে রণজয় বলে— "হয়তো বাংগালো-এর প্ল্যানটা ড্রপ করতে হবে। আমি বাড়িতে থাকলে রিয়ানকে আমি দেখে নেব। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন-এর পার্টির জন্য আমরা এই বার হোস্ট হচ্ছিলাম— একটু পিছিয়ে দেওয়া যায় না?"

রিম্পা জানায় সে ফিরে যাবে কলকাতা। রিয়ানের দায়িত্ব একা নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। রিম্পা এও জানায় যে, তার বাবা-মা রণজয়ের চাকরি দেখেই তাকে বিয়ে দিয়েছিল, তাই সে নিজের জীবন নষ্ট করতে চায় না। রিয়ানের জায়গা হবে রণজয়ের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছে গ্রামের বাড়িতে।

এক নিমেষে রণজয়ের চোখ থেকে খুলে যায় রঙিন চশমা। সে গ্রামের পরিবেশেই ছেলেকে আর বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে থাকে। কোনো রঙিন চশমা সে তার ছেলেকে কিনে দেবে না।

১০ বছর পর:-

রিয়ান এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে (ক্লাস-৬) পড়ে। রণজয় তাকে একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ায়; সে তার ছেলেকে কোনো 'রঙিন চশমা' কিনে দেয়নি। ছেলেটি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায় এবং গ্রামের মানুষের সেবা করতে চায়।

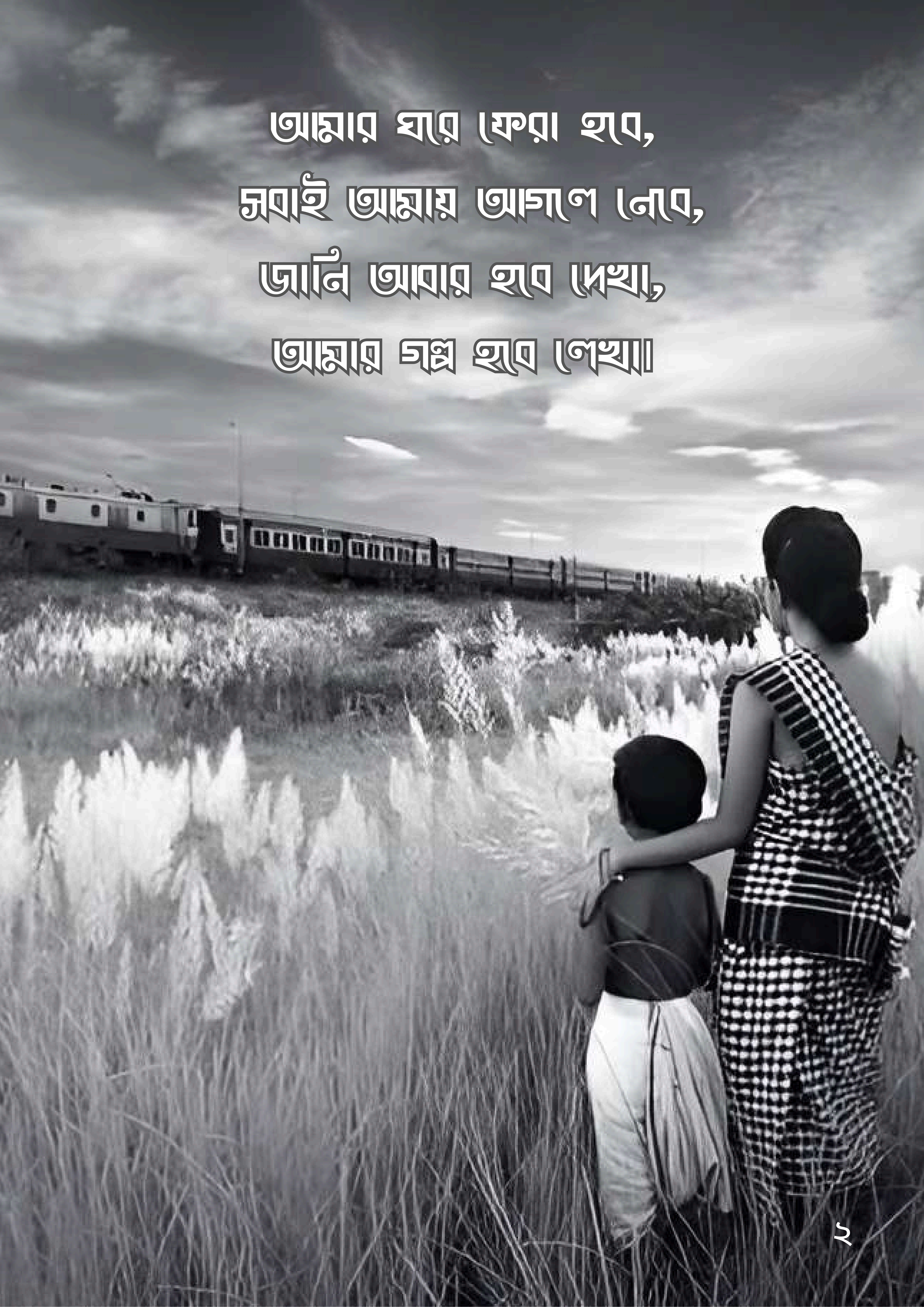
আমার ঘরে ফেরা হবে,
সবাই আমায় আগলে নেবে,
জানি আবার হবে দেখা,
আমার গল্প হবে লেখা।

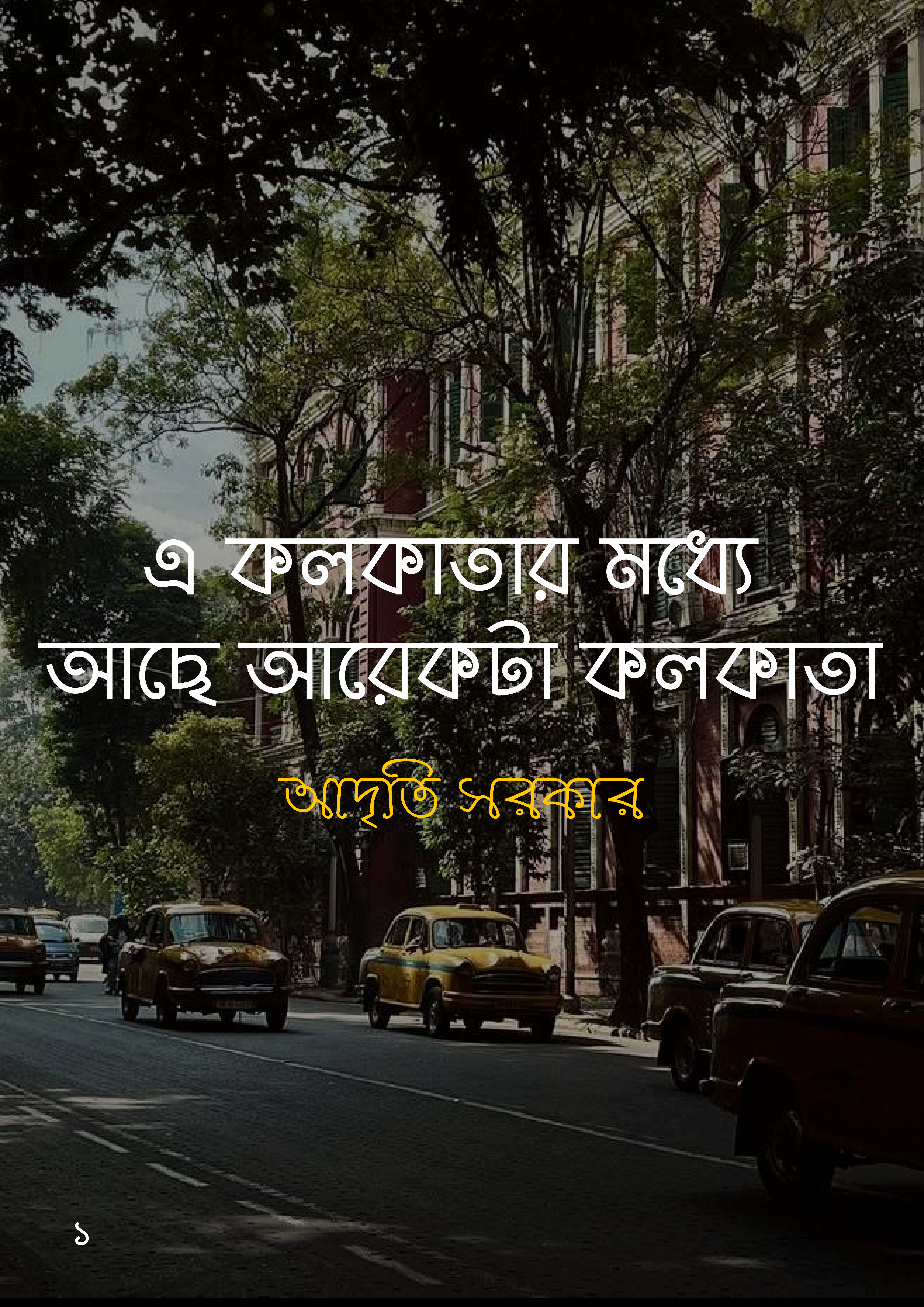

এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা

আদৃতি সরকার

তোমার লেখাটা খুব সুন্দর ও তথ্যবহুল, শুধু কিছু বানান ও ছোটখাটো শুদ্ধিকরণ দরকার। নিচে সংশোধিত সংস্করণটা দিলাম—

"এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা"

আজ কালের হাত ধরে দেখব সেই তিলোত্তমাকে। না, আমার শহর কোনো ইংরেজ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত নয়।

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী-তে কলকাতা “সাতগাঁও সরকারের এক পরগণা”। পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা গুরু নানকের জীবনী থেকেও জানা যায়, ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কলকাতায় এসে বসবাস করেন এবং এই স্থানটি অধুনা এম.জি. রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছাকাছি ছিল।

তবে ১৬৯৮ সালের ১০ই মে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৎকালীন জায়গীরদার বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর থেকে বার্ষিক ১৩০০ টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার প্রজাস্বত্ব লাভ করে। ব্রিটিশদের লোভ ছিল অপরিসীম। ক্রমে তারা এখানে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। তবে আজকের ফোর্ট উইলিয়াম কিন্তু সেই দুর্গ নয়। বরং আজকের কয়লাঘাট রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারের জায়গায় তৈরি হয়েছিল সেই কাঠের দুর্গ।

এই দুর্গ নির্মাণের খবর যখন মুর্শিদাবাদে নবাবের কাছে যায়, তরুণ তুর্কি বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন সেই দুর্গ ধুলায় মিশিয়ে দেন এবং কলকাতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন তাঁর মাতামহ তথা বাংলার আরেক রক্ষক আলীবর্দী খাঁ-এর নামানুসারে “আলিনগর”।

এই শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে হারিয়ে যাওয়া বহু ইতিহাস। আজ যেটা চিৎপুর রোড, সেটিই হলো কলকাতার প্রথম হালিশহর থেকে কালীঘাট হয়ে বরিশা অবধি নির্মিত পাকা রাস্তা। এটি নির্মাণ করেন লক্ষীকান্ত রায়চৌধুরী, কলকাতার প্রথম নিষ্কর জায়গীরদার। ব্রিটিশদের কাছে এটি ছিল **Pilgrims Road**।

“ব্ল্যাক জমিদার” গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির, যা উচ্চতায় আজকের শহীদ মিনারকেও হার মানাত, অবস্থিত ছিল এই চিৎপুর রোডের ওপরেই। আজ তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

আরও একটি হারানো জলপথ, যা পশ্চিমে গঙ্গা থেকে পূর্বে বিদ্যাধরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেটি বুজিয়ে তৈরি হয়েছে আজকের ক্রিক রো।এর সঙ্গে আমাদের স্কুলের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। ১৮১৬ সালের অক্টোবর মাসে লরেটো সন্ন্যাসিনীরা শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে নর্থ রোডের এক আর্মেনীয়, মি. ফাত উল্লাহ আসফার সাহেবের ১০০ বিঘার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁরা চলে আসেন আমাদের মিডলটন রো-এর লরেটো হাউসে।

অধুনা রসা রোডের ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস স্কুলের বিপরীতে একটি বড় বাগানবেষ্টিত পুকুর ছিল, যার মাঝখানে ছিল একটি গোল ইমারত। হারিয়ে যাওয়া এই জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য স্থানের নাম ছিল "ভবানীপুরের জল টুঙ্গি"। মালিক হেনরি পিস ফস্টার সাহেব ঘরের মেঝে থেকে সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে যেতেন এই পুকুরে স্নান করতে বা মাছ ধরতে। আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ভবানীপুর পেট্রল পাম্প।

আজকের ওল্ড ফোর্ট ঘাট স্ট্রিট, যেখানে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা ছিল, তার একটু এগিয়ে ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ পালের মুদির দোকান। এই চন্দ্রনাথ পাল তখনকার সময়ের ইংরেজদের সমস্ত মনিহারি দ্রব্য সরবরাহ করতেন। তাঁর নামেই পাশের ঘাটের নাম হয়েছে আজকের "চাঁদপাল ঘাট"।

১৮২০ সালে এই ঘাটেই ভারতের প্রথম বাষ্পীয় পাম্প বসানো হয়, যেখান থেকে কলকাতার জল সরবরাহ শুরু হয়।

যদি চাও, আমি এটাকে আরও সাহিত্যিক/প্রবন্ধধর্মী করে **polish** করেও দিতে পারি।

কলকাতা শুরুর দিন থেকেই মেলা মুখরিত উৎসবের শহর। বাংলা তথা কলকাতার এক বহু প্রাচীন উৎসব গাজনের চড়ক মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবকে পুজো করে এই চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত হতো। তার নামে আজও কলকাতার দুটি রাস্তা বিদ্যমান-যার একটি চড়ক ডাঙ্গা স্ট্রিট। চড়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে এইখানে বসত বিরাট মেলা। যেখানে বহু মানুষ বুলবুলি লড়াই, মোরগ লড়াই, গাজনের আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ দেখতে আসতো। উৎসবের পাশাপাশি এই শহর দেখেছে ব্রিটিশের নৃশংসতা। যার সাক্ষ্য আজকের "ফ্যান্সি লেন"।

ব্রিটিশরা এই রাস্তার একটি বড় গাছে ব্রিটিশ বিরোধী কাজের অভিযোগে প্রকাশ্য দিবালোলোক জনসমখ্যে বহুনিরপরাধ মানুষের ফাঁসি দিতো আর তা দেখতেও বহু মানুষের ভিড় জমতো। এই "ফাঁসি" থেকে হয়েছে "ফ্যান্সি লেন"।

সাহিত্যের পটভূমিকায় কলকাতার গুরুত্ব অপরিসীম যা ফিরে ফিরে এসেছে আমাদের কাছে শরদিন্দুর 'ব্যোমকেশ'-এ শিবরাম চক্রবর্তীর হাস্য রচনায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা'-য়, সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'- এ, শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, গগনেন্দ্রনাথ ও যামিনী রায়ের আঁকায় ও আমাদের প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সাহিত্যে। এনারা উত্তরসুরিতে রেখে গেছেন কলকাতাকে আরো ভালো করে জানা ও বোঝার জন্য পূর্ণেন্দু পত্রী ও পিটি নায়ারকে।

আমাদের এই প্রাচীন শহর পরিবর্তিত হয়েছে ব্যাঘ্র সংকুল চৌরঙ্গীর জঙ্গল থেকে অধুনা পার্কস্ট্রিট ও ধর্মতলায়। পরিবর্তিত হয়েছে চিৎপুরের চিতে ডাকাতের থেকে আজকের কুমোরটুলি, মনোহর পুকুর রোডের মনোহর ডাকাতের থেকে ম্যাডক্স স্কোয়ার। তবু আমার শহর দাঁড়িয়ে থাকে ইতিহাসের এক অতন্দ্র প্রহরী হয়ে।

"কলকাতা কলকাতাতেই, আমার শহর"

নরকের দলিল-
এপস্টিন ফাইলস্

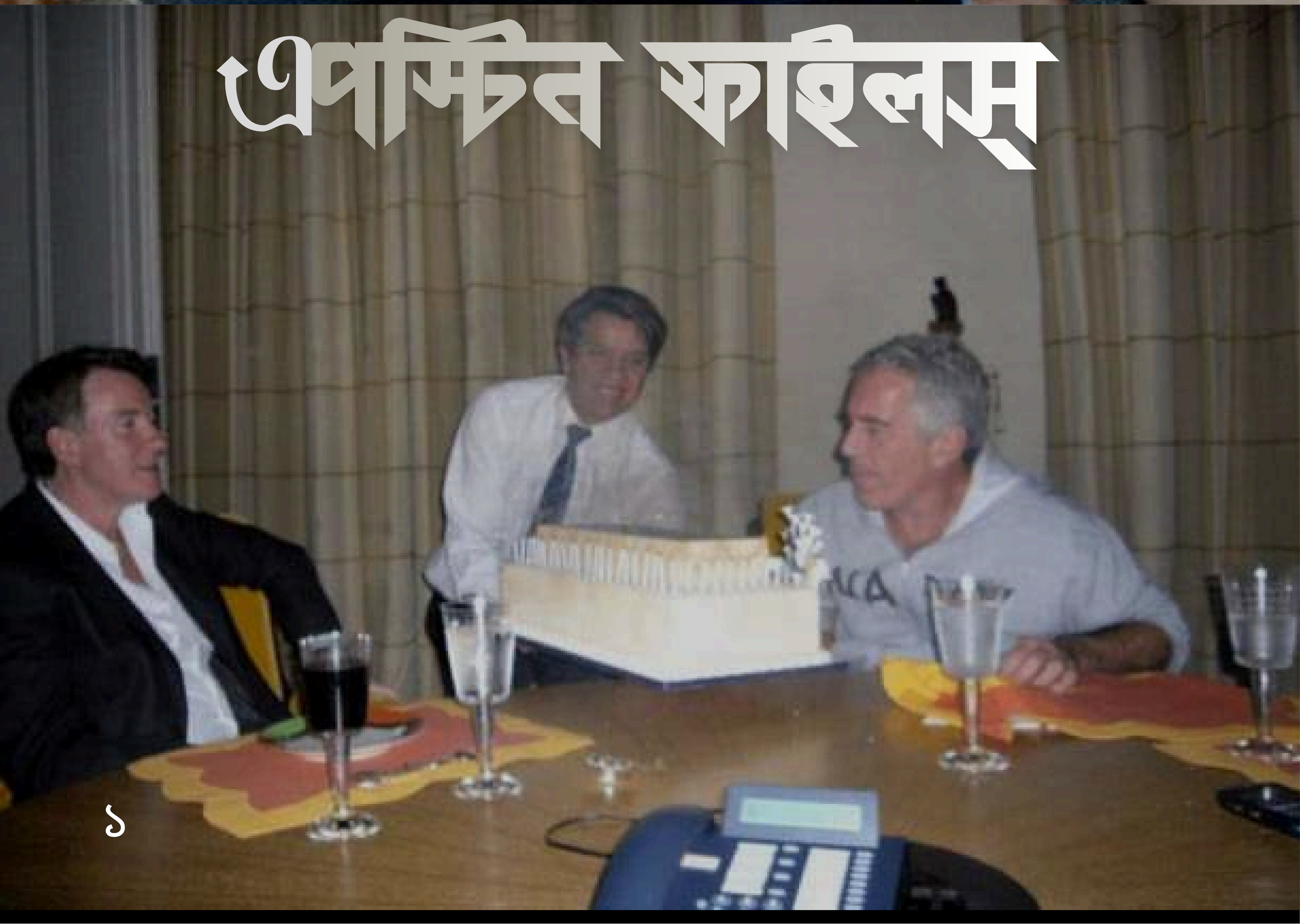

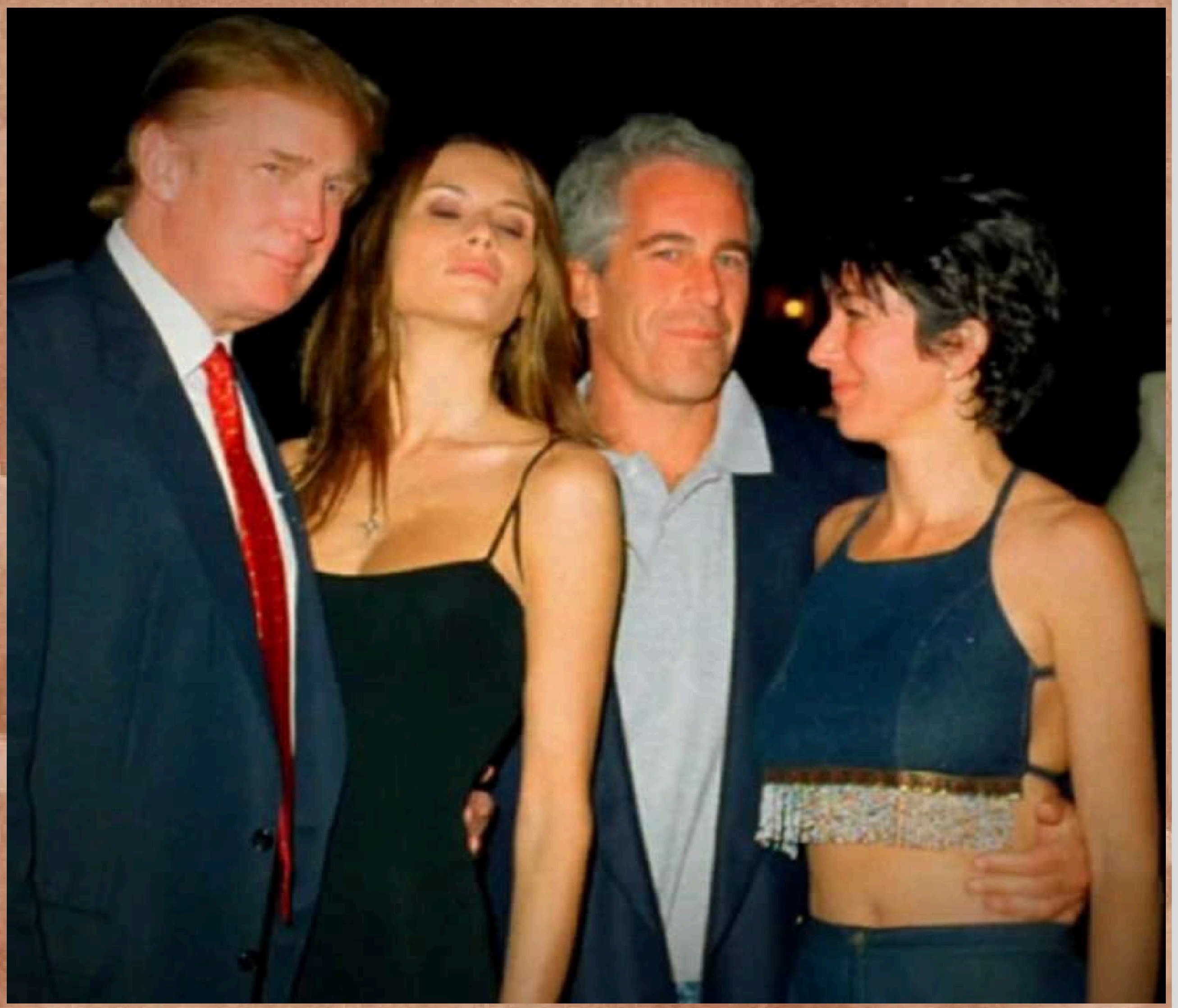

এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশুকে প্রশাসন তাঁদের পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারছেন। কিন্তু বাকিদের কোন খোঁজ পাচ্ছেনা প্রশাসন। তবে এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে যে এই সমস্ত নিখোঁজ শিশুরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে? আন্তর্জাতিক চাইল্ড কেয়ার সংস্থার মতামত অনুযায়ী নিষ্পাপ শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের বিক্রি করে দেওয়া হয় নিষিদ্ধ পল্লীতে দেহ ব্যবসা করার জন্য। বেশিরভাগ অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের বিভিন্ন

রকমের কাজের ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে এবং শিশুদের চকলেট ও রকমারি জিনিসের প্রলোভন অথবা বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন ইত্যাদি উপায়ে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।এখান থেকেই শুরু হচ্ছে নরকের দলিল এপস্টিন ফাইলস্-এর মুখ্য তথ্য। আমেরিকার আইল্যান্ডসের লিটল সেইন্ট জেমস্দ্বীপের মালিক হলেন ধনকুবের জেফ্রি এডওয়ার্ড এপস্টিন। ইনি একজন কুখ্যাত যৌন অপরাধী ছিলেন। জেফ্রিকে এই কাজের জন্য পুলিশ আটক করে এবং তাঁর বিলাস বহুল মহল থেকে যেসমস্ত নথি উদ্ধার করে, সেগুলোকেই একত্রে;এপস্টিন ফাইলস; নামে সম্বোধন করা হয়।মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ

আপডেট অনুযায়ী ৩.৫ মিলিয়নেরও বেশি পৃষ্ঠার নথি, লক্ষাধিক ছবি, দুহাজারেরও বেশি ভিডিও যা যথেষ্ঠ আপত্তিকর, বিশ্বের তাবড় তাবড় মানুষদের নাম ও তাদের কন্টাক্ট নাম্বার, ইমেইল এবং বিশ্বের হেভিওয়েট মানুষদের তাঁর দ্বীপে বিমানে যাতায়াতের তথ্য এবং আদালতের নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সমস্ত নথি থেকে যে হাড়হিম করা তথ্য জানা যায় তাহল, এপস্টিন সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২ বছর থেকে শুরু করে ১৮ বছরেরমধ্যে শিশু ও কিশোরীদের নিয়ে আসতেন তাঁর সেন্ট জেমস দ্বীপের সেই বিলাস বহুল মহলে শুধু মাত্র তাদের উপরে শারীরিক নির্যাতন, পাশবিকভাবে যৌন নির্যাতন ও অত্যাচার করে মনোরঞ্জন পেতে। এই ফাইল আরো তথ্য দেয় যে, আমরা

এ বিষয়ে জানার আগে জানা যাক্ নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে। সারা পৃথিবী জুড়ে রমরমিয়ে যে শিশু পাচার চক্রের ব্যবসা চলছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষেই এই সংখ্যাটি হল বছরে প্রায় ৬২ হাজার ৯৪৬টি। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বলছে, আটলান্টিক পারের দেশটিতেই এই সংখ্যাটি প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড নামের আন্তর্জাতিক সংস্থা জানাচ্ছে, সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বছর উধাও হচ্ছে প্রায় ৮০ লক্ষ শিশু। এদের মধ্যে অপহরণ যেমন আছে তেমনি নিখোঁজ শিশুর কেসও আছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশুকে প্রশাসন তাঁদের পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারছেন। কিন্তু বাকিদের কোন খোঁজ পাচ্ছেনা প্রশাসন। তবে এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে যে এই সমস্ত নিখোঁজ শিশুরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে? আন্তর্জাতিক চাইল্ড কেয়ার সংস্থার মতামত অনুযায়ী নিষ্পাপ শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরীদের বিক্রি করে দেওয়া হয় নিষিদ্ধ পল্লীতে দেহ ব্যবসা করার জন্য।;এপস্টিন ফাইলস্; সম্পর্কে প্রতিবেদনটি লেখার তাগিদ অনুভব করলাম।আমার কাছে এই ফাইল সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আছে,তাতে এটিকে নরকের দলিল সম বলা চলে । ২০২৬সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত হয় এই ফাইলটি, যা আজকের তারিখেও সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।;এপস্টিন ফাইলস; এর বিভিন্ন নথির মধ্যে কিছু তথ্য ছিল ২ বছর বয়সী শিশুদের থেকে শুরু করে আমাদের মতো ১৮য় সবেমাত্র পা দেওয়া কিশোরীদের বিষয়ে।

এ বিষয়ে জানার আগে জানা যাক্ নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে। সারা পৃথিবী জুড়ে রমরমিয়ে যে শিশু পাচার চক্রের ব্যবসা চলছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষেই এই সংখ্যাটি হল বছরে প্রায় ৬২ হাজার ৯৪৬টি।অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বলছে, আটলান্টিক পারের দেশটিতেই এই সংখ্যাটি প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ডএক্সপ্লয়েটেড নামের আন্তর্জাতিক সংস্থা জানাচ্ছে, সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বছর উধাও হচ্ছে প্রায় ৮০ লক্ষ শিশু। এদের মধ্যে অপহরণ যেমন আছে তেমনি নিখোঁজ শিশুর কেসও আছে।

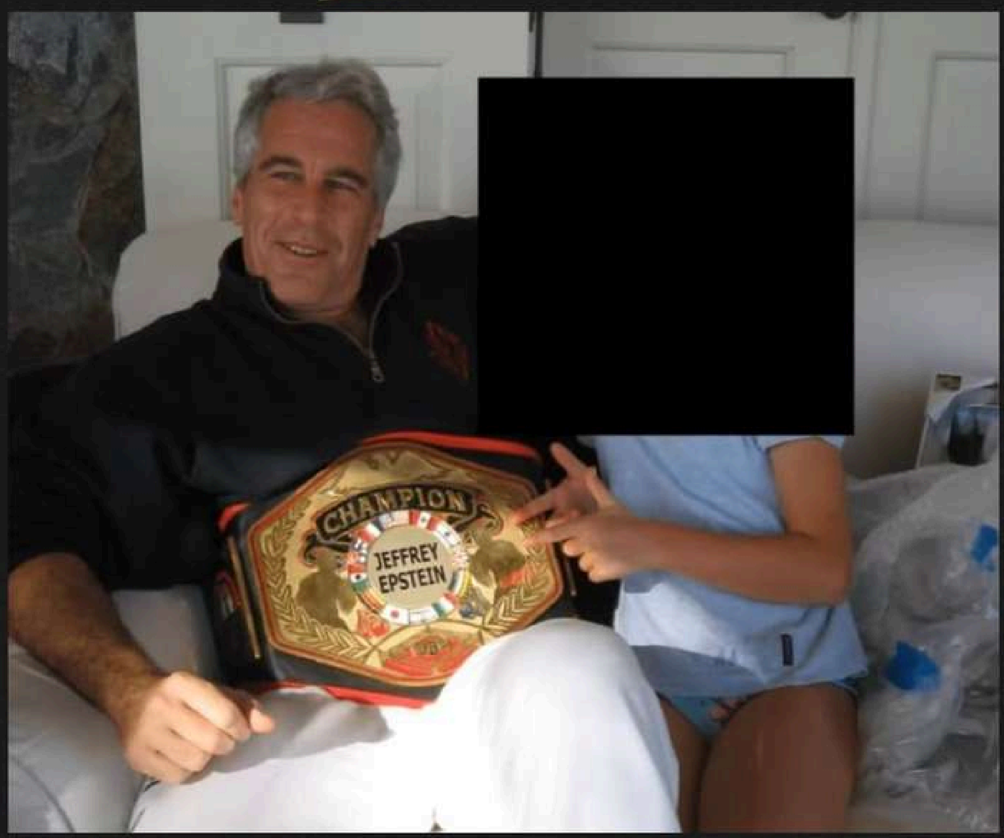

যাদের সমাজের ;আইকন; বলে মনে করি তাঁদের মধ্যেও প্রচুর মানুষ জেফ্রির পানিগ্রাহী ছিলেন নিজেদের নিষিদ্ধ বাসনা তৃপ্ত করার জন্য। এই কাজে এপস্টিন তাঁদের নিজের সেন্ট জেমস্ দ্বীপের মহলে রেখে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের ও অর্থের প্রয়োজনে।এই সমস্ত হেভিওয়েট ক্ষমতাশালী সমাজের উচ্চবৃত্তদের মধ্যে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কেউ কেউ হলেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং (আগে নাম থাকলেও বর্তমানে সেই নাম নথি থেকে নিখোঁজ), প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন,

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, বিল গেটস, ইলন মাস্ক, প্রয়াত বিনোদন শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন, ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য প্রাক্তন

প্রিন্স অ্যান্ড্রু এবং আরো শতাধিক হেভিওয়েটের মানুষ। এঁদের বিকৃত মানসিকতা। মানবিকতার গলা টিপে ছোট ছোট শিশুদের

ও কিশোরীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার করে তাদের শারীরিক বাসনাকে পূর্ণ করেছে দিনের পর দিন। কেউ রেয়াত পেত না এই অত্যাচার থেকে। তবে কিশোরীদের কিছু শর্তের বিনিময়ে দেশে ফেরার অনুমতি মিলত। নথি বলছে, শর্তানুযায়ী ফিরে গিয়ে তাদের বয়সী বা আরও ছোট বাচ্চাদের স্কুলের ও অন্যান্য বন্ধুদের অর্থ কিংবা অন্যকিছুর প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকেও এই নরকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে হত।এপস্টিন ফাইলের তথ্য অনুযায়ী ঐ সমস্ত হেভিওয়েট মানুষরা এমনকি এপস্টিন নিজেও রসনাতৃপ্ত করতে শিশুদের দেহাংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভক্ষণ করত (এখনো যথাযথ প্রমাণ মেলেনি)। এপস্টিনকে এই সমস্ত নারকীয় কাজে যে সক্রিয়ভাবে সহযোগীতা করতেন তিনি নারী সমাজের কলঙ্ক স্বরূপা - গিলেন ম্যাক্সওয়েল, বর্তমানে ইনি ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী এপস্টিনকে এই সমস্ত নারকীয়

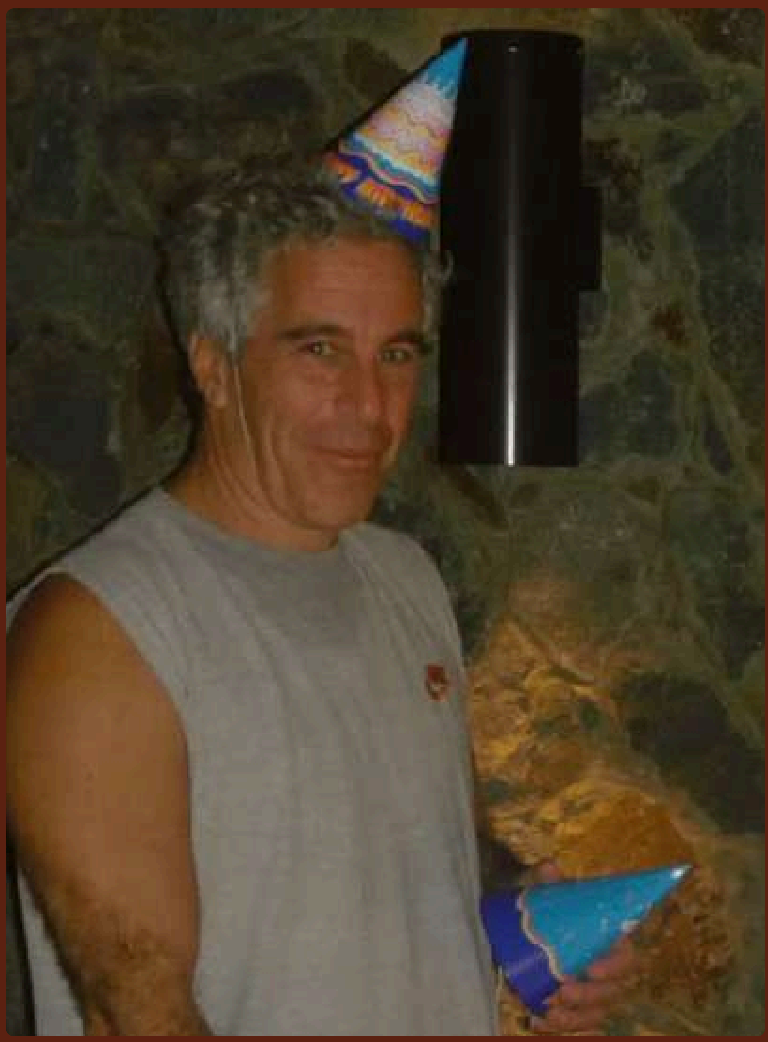

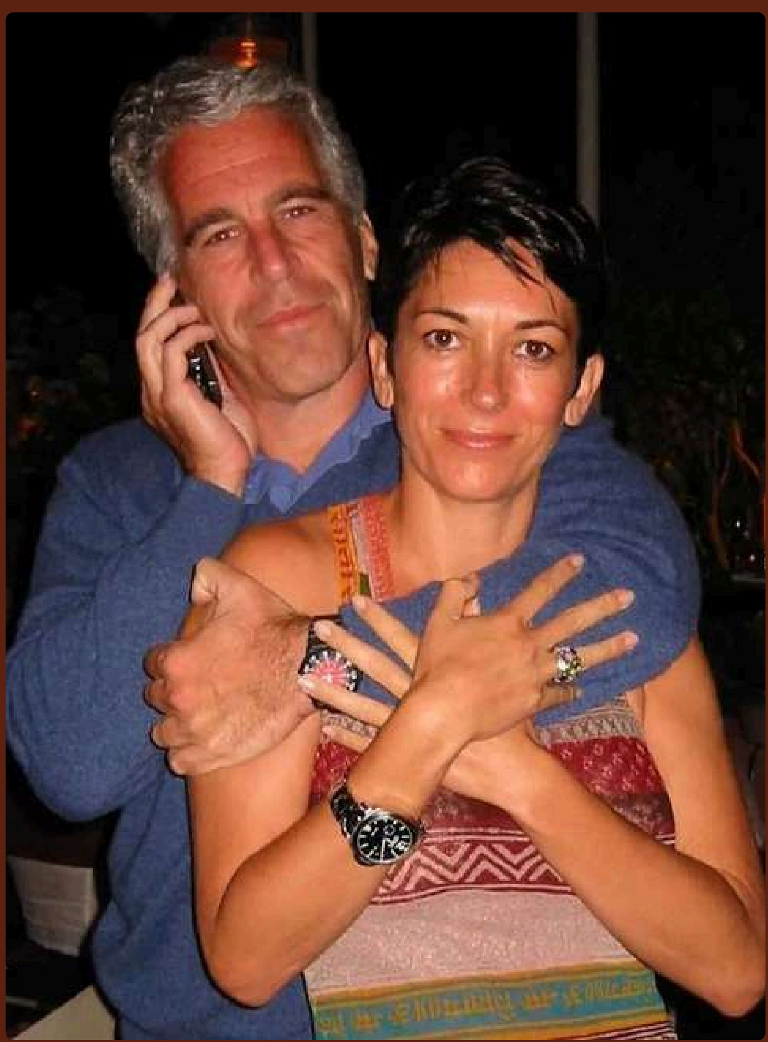

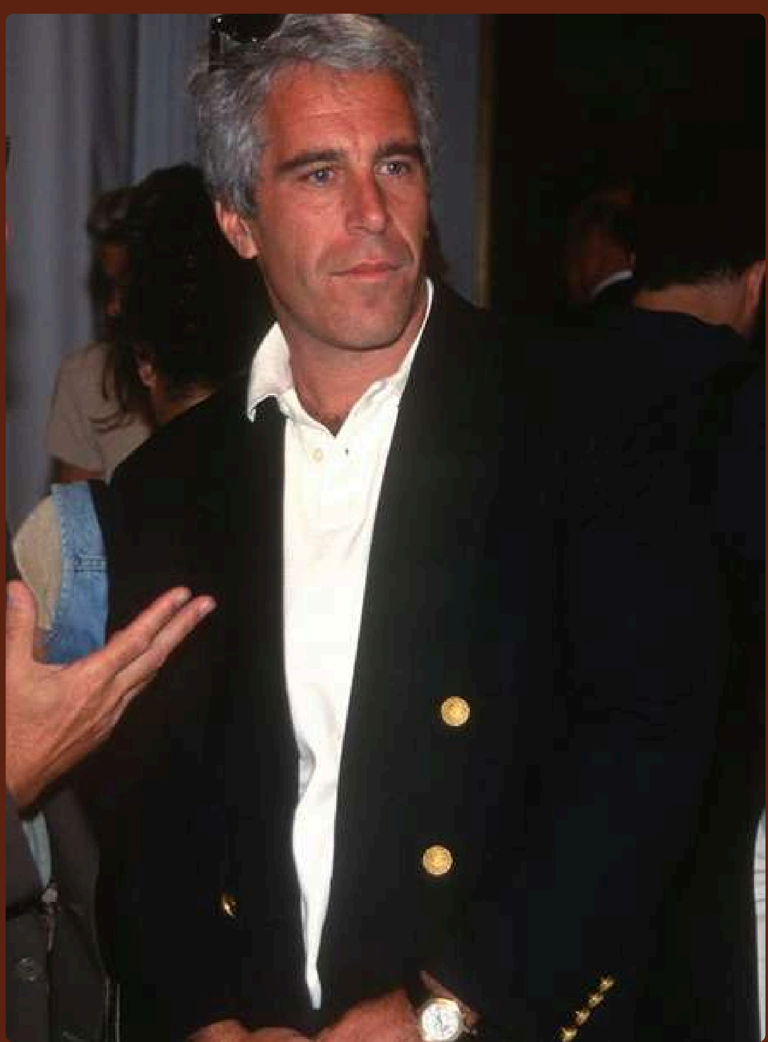

কাজে যে সক্রিয়ভাবে সহযোগীতা করতেন তিনি নারী সমাজের কলঙ্ক ম্যাক্সওয়েল, বর্তমানেইনি ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী স্বরূপা - গিলে নরাখেনা।সর্বোপরি এটা অনস্বীকার্য যে, নিজেদের, ও কিছু ক্ষেত্রে, পরিবারের অসাবধানতার কারণে যে সমস্ত কিশোরী ও শিশুরা চিরতরে অন্ধকার জগতে হারিয়ে গেল তা আশাতীত। তাই আমাদের সকলকেই সজাগ থাকতে হবে। সর্বাগ্রে নিজেদের প্রলোভন মুক্ত করতে হবে। অবশ্যই পরিবারের দেওয়া সাবধানবাণীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সচেতনভাবে পথ চলতে হবে। মনে রাখতে হবে সচেতনতা রাখেনা।

যেখানে সাবধানতাও সেখানে।

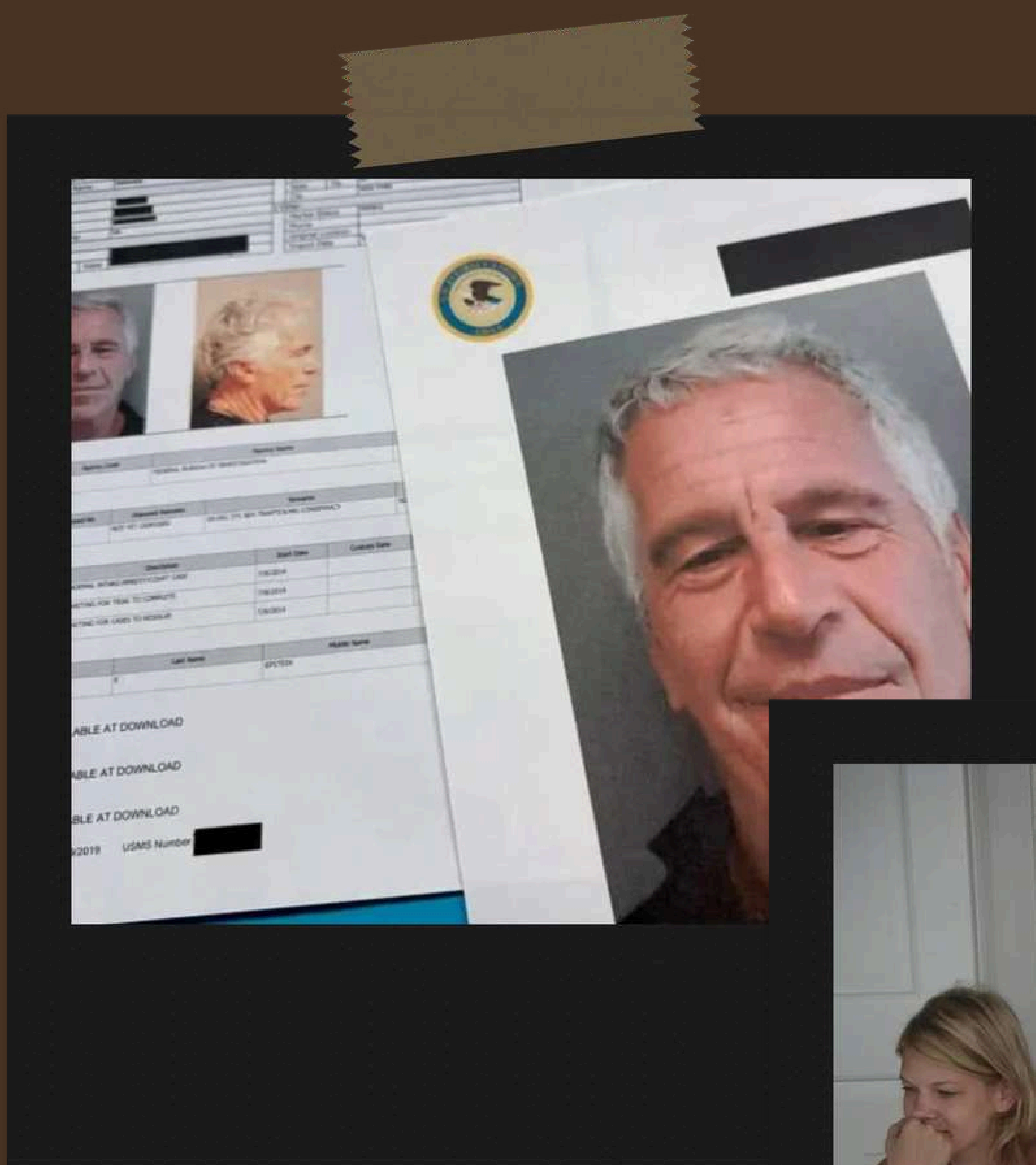

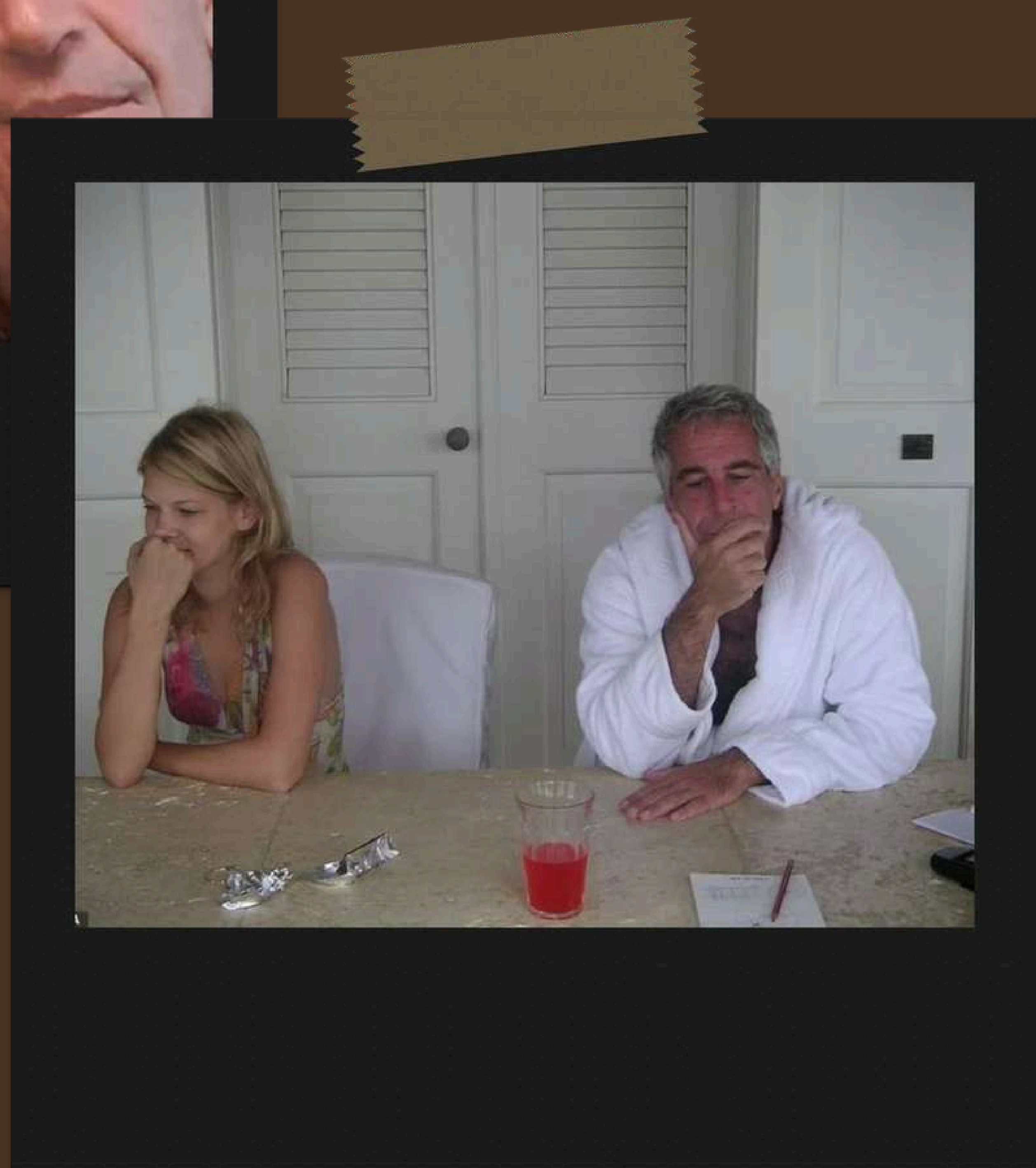

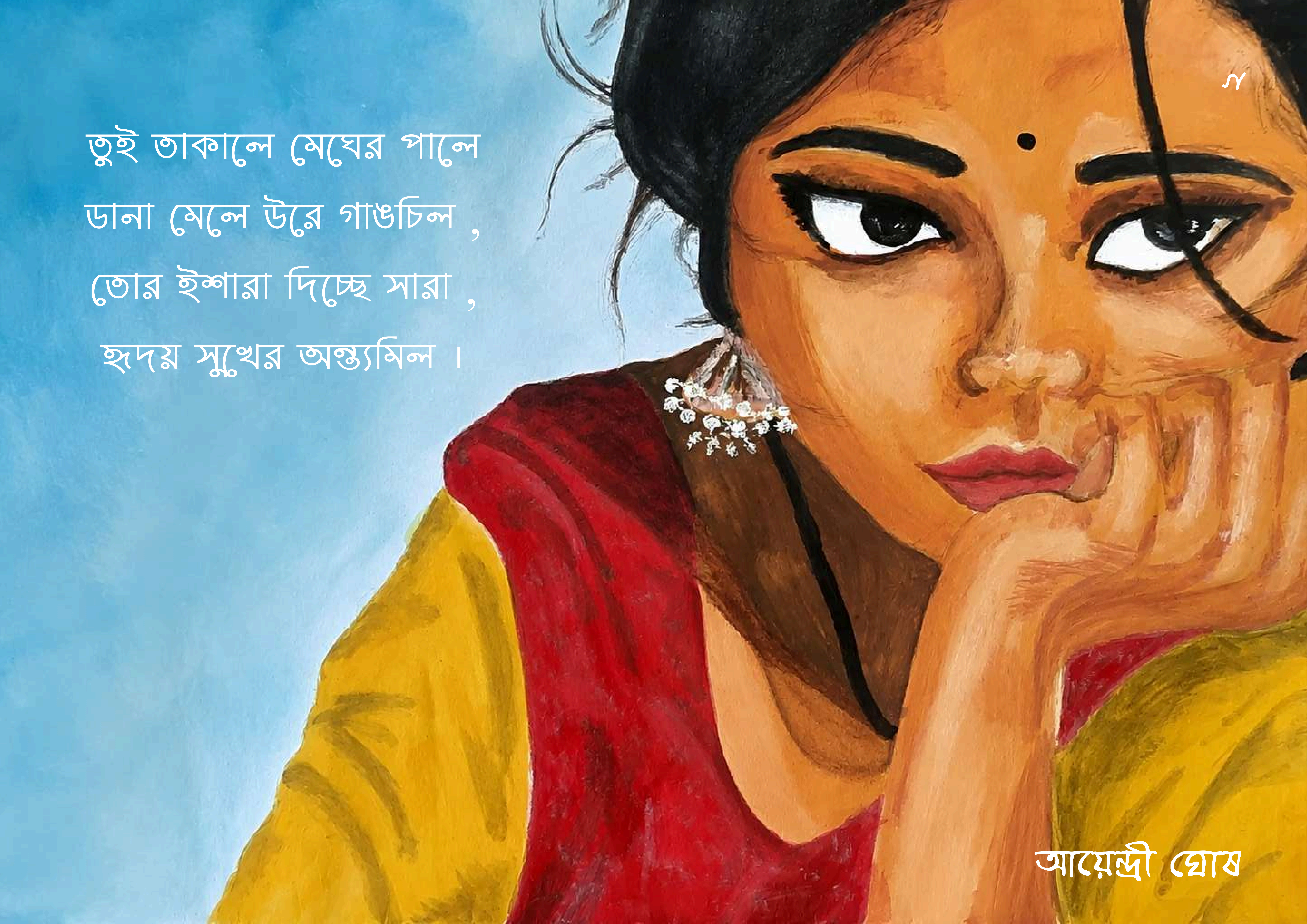
তুই তাকালে মেঘের পানে
ডানা মেলে উরে গাঙচিল ,
তোর ইশারা দিচ্ছে সারা ,
হৃদয় সুখের অন্ত্যমিল ।
আয়েন্দ্রী ঘোষ

গল্প হলেও সত্যি

আরোহী বি. ভট্টাচার্য্য

রাত্রি এগারোটায় ট্রেন এসে থামল পুরুলিয়ার বেগুনকোদর স্টেশনে। ঝটপট জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে নেমে পড়ল "রুহ্"। ঘন কালো অন্ধকার রাত, যেন স্টেশনটিকে ঘিরে রেখেছে। অনেক দূরে একটা আবছা আলো চোখে পড়ল রুহর। হঠাৎ এই গভীর অন্ধকারে আস্তে আস্তে নিজের চোখকে একটু অভ্যস্ত করে নিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল। কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই স্টেশনে নামতে হয় তাকে। এখান থেকে বাসে করে রওনা হয় বাড়ির পথে। ট্রেন প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেগুনকোদরে এসে পৌঁছায়, তবে আজ রেল অবরোধের কারণে ট্রেন ছাড়তে দেরি হওয়াতেই এত রাত্রি হয়ে গেল এখানে পৌঁছতে। শেষ বাস বহুক্ষণ আগেই এখান থেকে ছেড়ে দিয়েছে, এত রাত্রে বাস তো দূরের কথা, কোনো গাড়িই যে পাওয়া যাবে না সেই বিষয়ে রুহ নিশ্চিত। অগত্যা এই রাত্রিটুকু স্টেশনেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই গভীর অন্ধকার স্টেশনে সেই আবছা আলোটিকে লক্ষ্য করে রুহ হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দিল। ওইখানে নিশ্চয়ই টিকিট কাউন্টার অথবা কোন দোকান আছে, ভোর না হওয়া পর্যন্ত ওইখানেই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় তার মাথায় এলো না। স্টেশনে নামার পর থেকে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে রুহ্। ট্রেন থেকে সে ছাড়া আর কেউ এখানে নেমেছে বলেও মনে হচ্ছে না, আর স্টেশনেও কোন মানুষ নেই। কিন্তু রুহ্র যেন বারবার মনে হচ্ছে তার পিছনে কেউ হেঁটে আসছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে রুহ একবার ফিরে তাকালো পিছনে, কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই। রুহ্ আবার হাঁটতে শুরু করল, কয়েক মিনিট হাঁটার পরেই তার মনে হলো যে সে যেন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হাঁটার গতি কমিয়ে ফেলল রুহ, নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে সতর্কভাবে সে বোঝার চেষ্টা করল যে শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে। ঠিকই আন্দাজ করলো সে, নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন তার পিছনেই আসছে। ক্রমাগত শব্দটা যেন আরো কাছে চলে আসতে থাকলো। নভেম্বর মাসের হাড়হিম ঠান্ডার রাত্রিতেও যেন একটু একটু ঘামতে শুরু করেছে রুহ। তবে কি এতদিন এই স্টেশনের সম্পর্কে শোনা নানান অলৌকিক ভুতুড়ে গল্পগুলি সত্যি! সত্যিই কি রাত্রি নামার সাথে সাথে

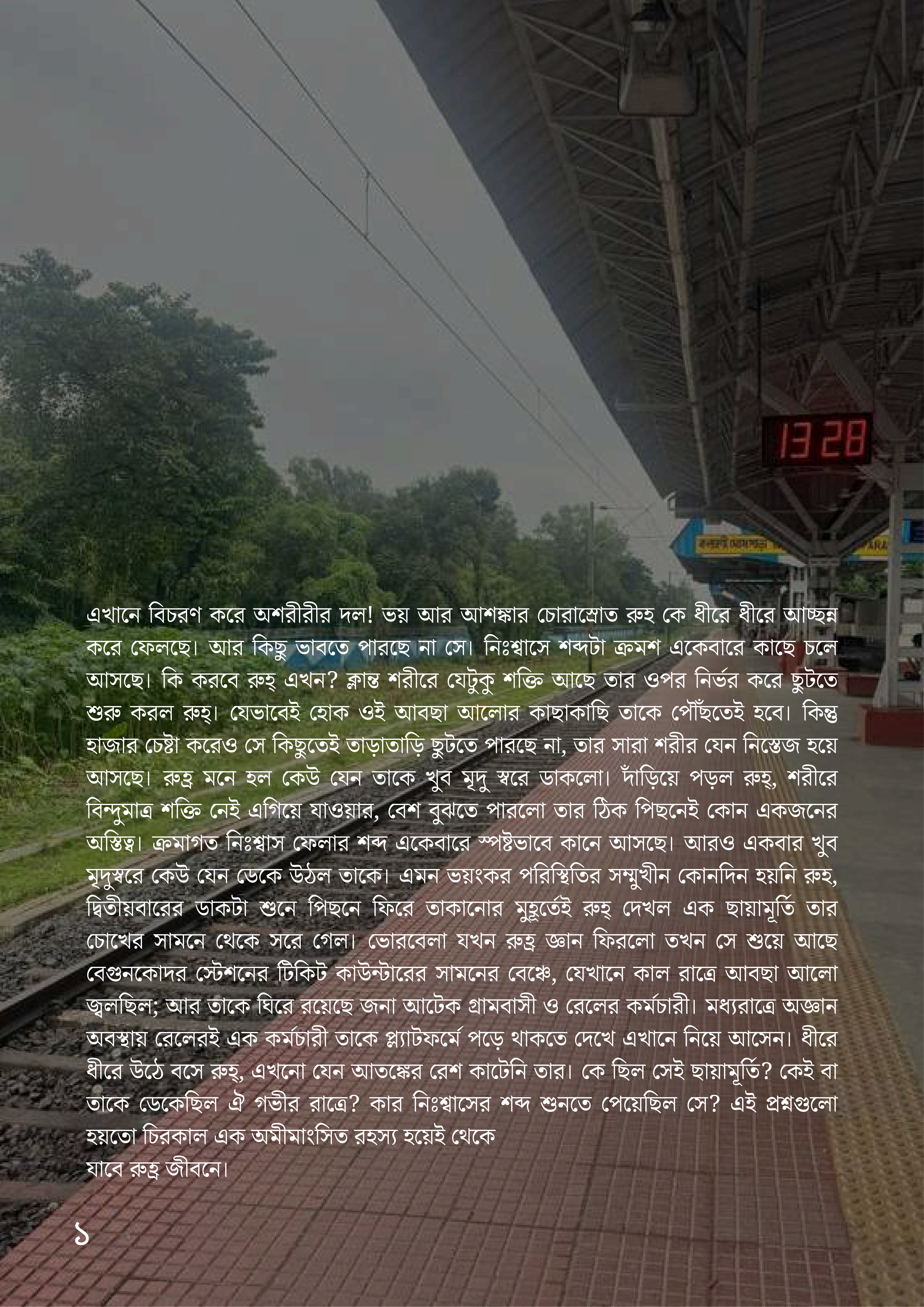

এখানে বিচরণ করে অশরীরীর দল! ভয় আর আশঙ্কার চোরাস্রোত রুহ কে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। নিঃশ্বাসে শব্দটা ক্রমশ একেবারে কাছে চলে আসছে। কি করবে রুহ্ এখন? ক্লান্ত শরীরে যেটুকু শক্তি আছে তার ওপর নির্ভর করে ছুটতে শুরু করল রুহ্। যেভাবেই হোক ওই আবছা আলোর কাছাকাছি তাকে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে কিছুতেই তাড়াতাড়ি ছুটতে পারছে না, তার সারা শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে। রুহ্র মনে হল কেউ যেন তাকে খুব মৃদু স্বরে ডাকলো। দাঁড়িয়ে পড়ল রুহ্, শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই এগিয়ে যাওয়ার, বেশ বুঝতে পারলো তার ঠিক পিছনেই কোন একজনের অস্তিত্ব। ক্রমাগত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ একেবারে স্পষ্টভাবে কানে আসছে। আরও একবার খুব মৃদুস্বরে কেউ যেন ডেকে উঠল তাকে। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন কোনদিন হয়নি রুহ, দ্বিতীয়বারের ডাকটা শুনে পিছনে ফিরে তাকানোর মুহূর্তেই রুহ্ দেখল এক ছায়ামূর্তি তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ভোরবেলা যখন রুহ্র জ্ঞান ফিরলো তখন সে শুয়ে আছে বেগুনকোদর স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনের বেঞ্চে, যেখানে কাল রাত্রে আবছা আলো জ্বলছিল; আর তাকে ঘিরে রয়েছে জনা আটেক গ্রামবাসী ও রেলের কর্মচারী। মধ্যরাত্রে অজ্ঞান অবস্থায় রেলেরই এক কর্মচারী তাকে প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে দেখে এখানে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে উঠে বসে রুহ্, এখনো যেন আতঙ্কের রেশ কাটেনি তার। কে ছিল সেই ছায়ামূর্তি? কেই বা তাকে ডেকেছিল ঐ গভীর রাত্রে? কার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে? এই প্রশ্নগুলো হয়তো চিরকাল এক অমীমাংসিত রহস্য হয়েই থেকে
যাবে রুহ্র জীবনে।

ছবিওয়ালা

থেমে থাকা অযথাই

“শহরের এই
ট্র্যাফিকের ভিড়ে
যদি আটকে যাই
কোনো বাঁকে”

“তবু মেঘের
আড়াল সরিয়ে ঠিক
রোদ পৌঁছাবে
তোমার ঘরে”

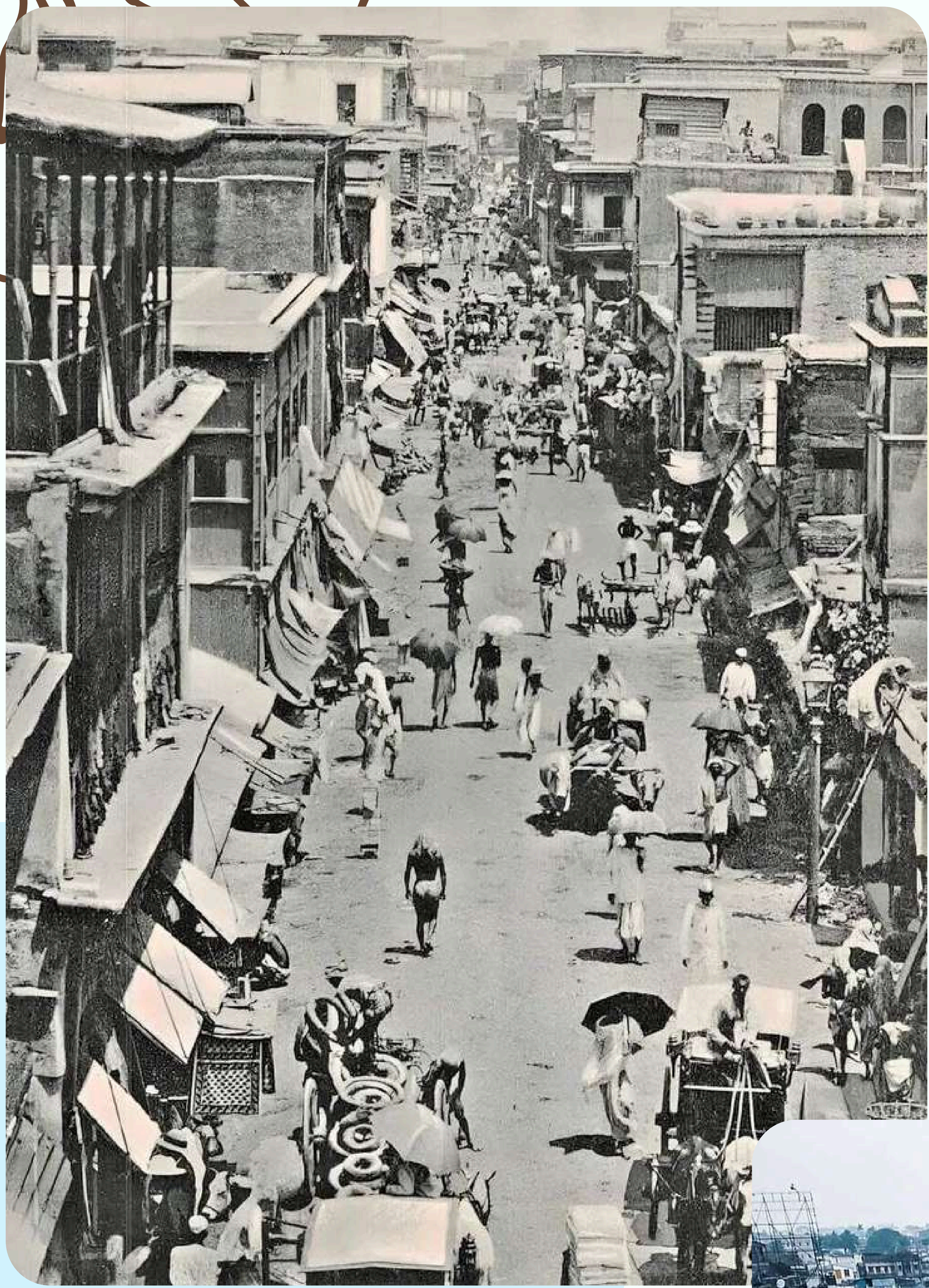

“পাশ দিয়ে পথ গেছে”

“দূরের থেকেও দূরে”

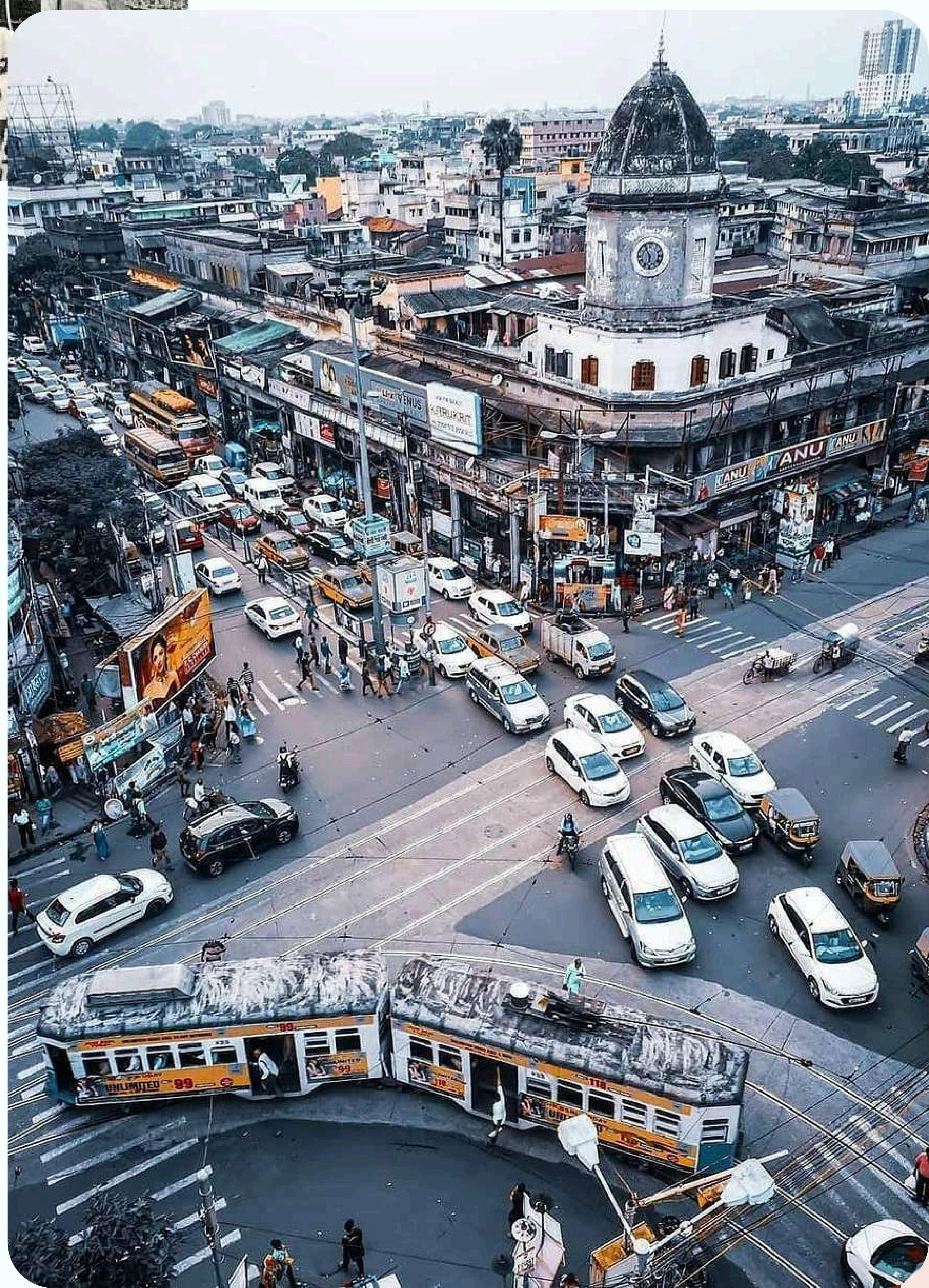

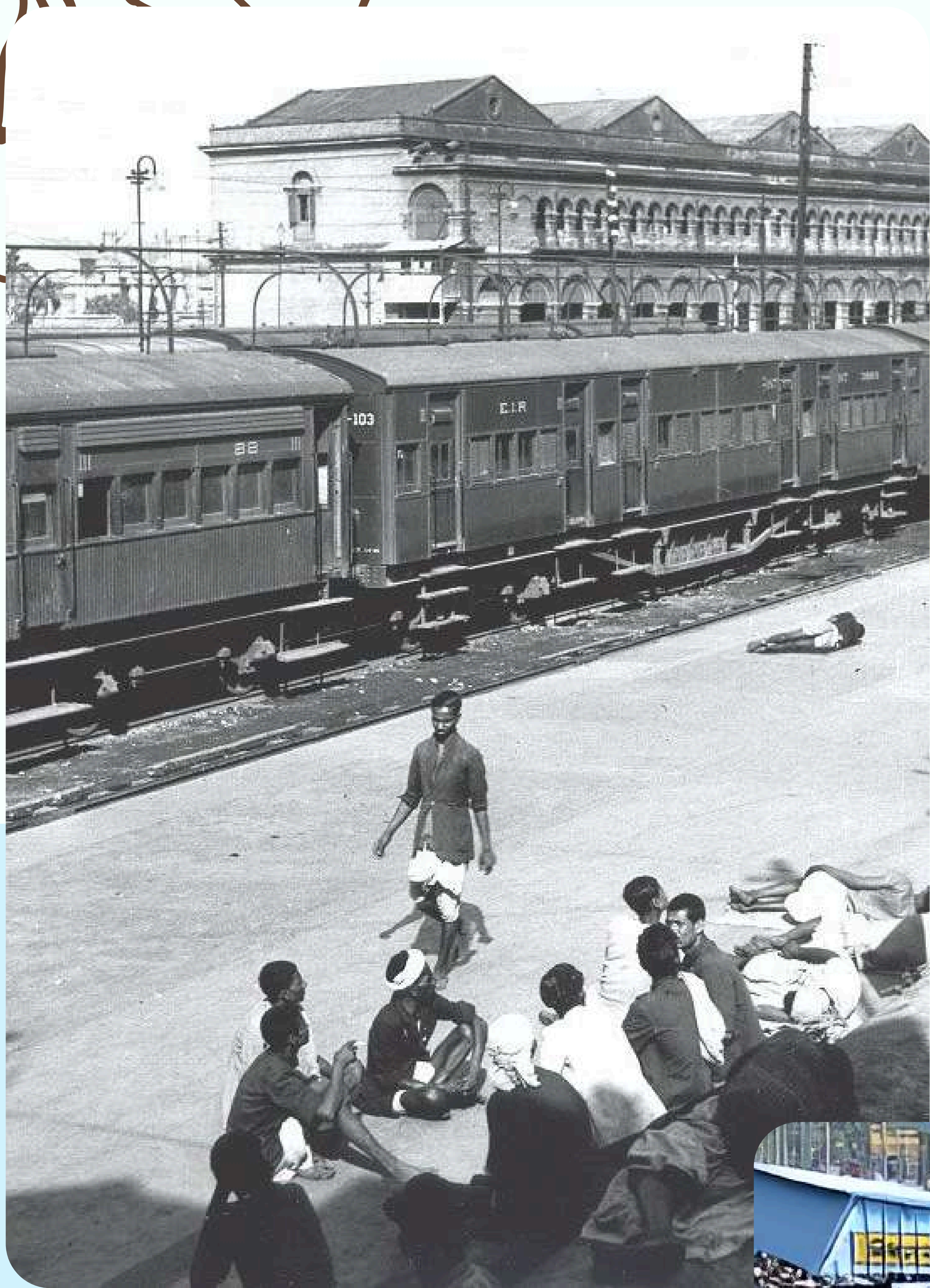

“এখনও আলগা
মনে কাশফুল
সারি সারি”

“বাস্তু সাপের
মতো সময়ের
রেলগাড়ি”

"সব খেলার সেরা

বাঙালির ,তুমি ফুটবল"

“অবাধ যত্নে সামলে
চলা ফুরিয়ে যাবার
ভয় ”

“সময় এলে
পড়বে চুঁয়ে,
নিজের স্বভাবে “

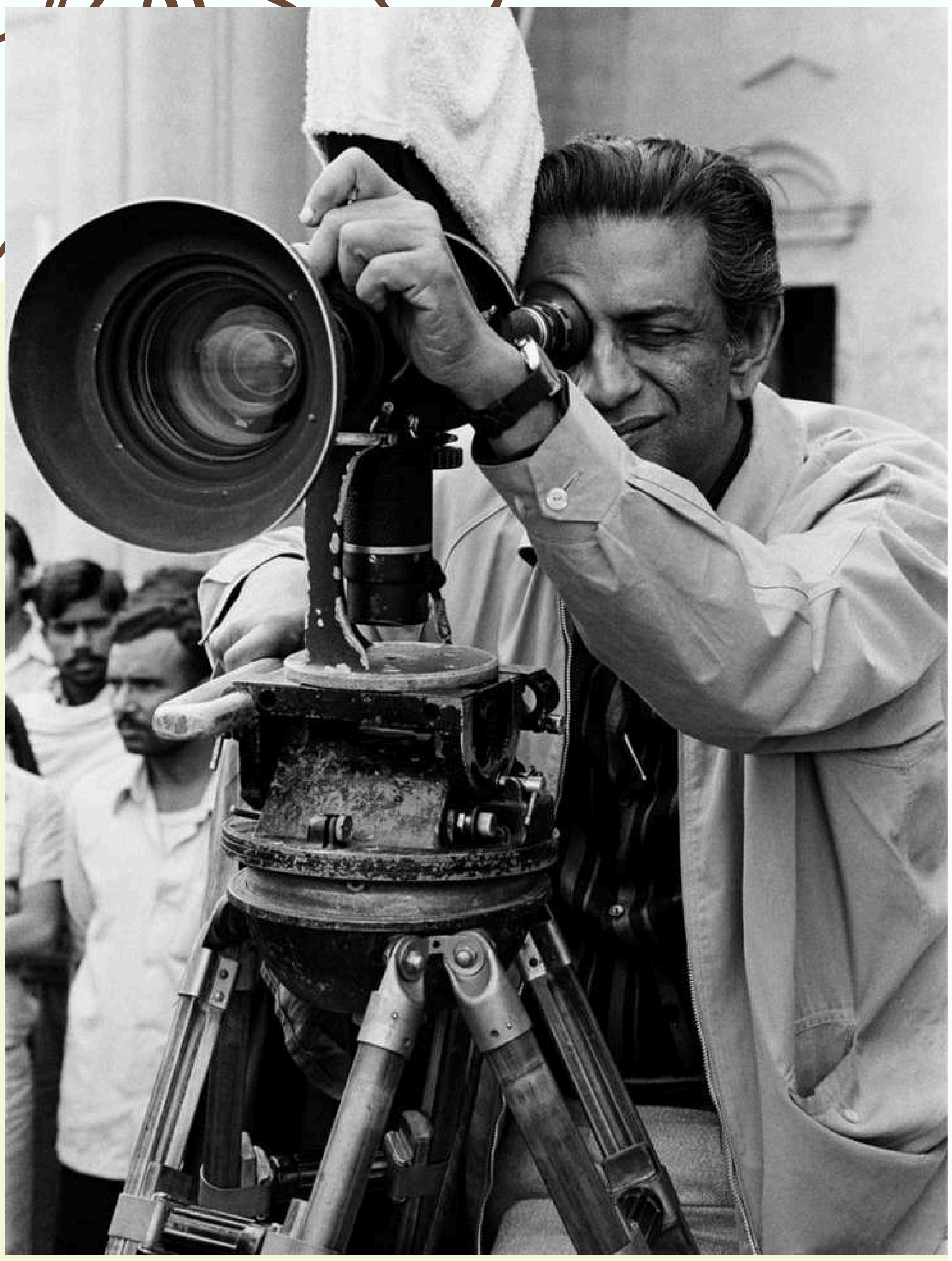

“অনাচার করো যদি
রাজা তবে ছাড়ো গদি”

“সব গল্পের শেষ
থাকে না,
কিছু গল্প শুরু
হয়”

“এখনও ছাদের
ঘরে আলতা
পায়ের ছাপে”

“চিত্রনাট্য যেন
সাজানো
সিঁড়ির ধাপে ”

"রূপং দেহি
জয়ং দেহি "

"যশো দেহি
দ্বিষো জহি"

“আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর;
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা”।

“নাছোড়বান্দা স্মৃতি সাদা আর কালো জুড়ে
অপুর পায়ের ছাপ ডুবছে বাঁশির সুরে”

अंतः अस्ति प्रारंभ

Loreto House

MARIA REGINA ANGELORUM
CRUCI DUM SPIRO FIDO